জাতির বরণীয় যাঁরা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

এস্‌, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স
১২, নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীসলীলকুমার মিত্র,—এস, কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স
১২, নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা

মূল্য বার আনা

মুদ্রাকর—শ্রীগৌরচন্দ্র পাল,—নিউ মহামায়া প্রেস
৬৫।৭ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কয়েকটি কথা

বিভিন্ন দেশের বীর ও মনীষীদের কথা আলোচনায় আমি কিছুকাল যাবৎ রত আছি। এই সময় একটি বিষয় বেশী করে আমার নজরে পড়েছে। যে-সব লোকের জীবনে চরম সাফল্য বা বিরাট্ ব্যর্থতা ঘটেছে তাঁদের পিতামাতার চরিত্র-প্রভাব তাঁদের উপরে অত্যধিক। আমি তাই তাঁদেব পিতামাতাদের জীবন-কাহিনী অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। এই কাজে প্রবৃত্ত হয়ে একটি বিষয় বার বার লক্ষ্য করেছি। বীর মনীষীদের পিতামাতারা অনেকেই নিতান্ত সাধারণ মানুষই ছিলেন, সাধারণ মানুষের মতই কষ্টে দুঃখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতেন। কিন্তু এই সাধারণ নর-নারীরা কোন কোন বিষয়ে অন্যদের চেয়ে অনেক উর্দ্ধে ছিলেন। তাঁদের ছোটখাট জীবনেও তা বেশ প্রকট হয়ে উঠেছিল। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সন্তানদের ভিতরে অনুক্রামিত হয়ে অনুকূল পরিবেশে সুপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়েছে। পুস্তকের কাহিনীগুলি পড়বার সময় এই কথা কয়টি বিশেষ করে মনে রাখা দরকার।

আমি এখানে যাঁদের কথা বলেছি তাঁরা খুব সাধারণ মানুষ ছিলেন বলেই সমসামযিক বা পরবর্ত্তী কোন কাহিনীতে তাঁদের কথা কিছুই পাওয়া যায় না। তবে বীর মনীষীরা যে-সব আত্ম-চরিত লিখে গেছেন তাতে তাঁদের পিতামাতা সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এই তথ্যমাত্র সম্বল করে আমি

এ পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। বিশেষ করে কিশোর ছাত্র-ছাত্রীদেরই আমি আমার কথা শোনাতে চাই। একারণ তাদেরই ভাষায় বলতে চেষ্টা করেছি। কতটা সফল হযেছি তারাই বিচার করবে। আমাদের মাতৃভাষায় বোধ করি এ ধরণের পুস্তক খুব কমই আছে। আশা করি, অন্যেরা বিস্তৃততর ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করে অধিকতর পূর্ণাঙ্গ বই লিখবেন। এই পুস্তক রচনায় যে-সব বই থেকে সাহায্য পেয়েছি, পরিশিষ্টে তার উল্লেখ করা হ'ল। আলোচ্য বিষয়গুলিতে এবং আনুষঙ্গিক বিষয় সম্বন্ধেও যদি কেউ নূতন তথ্যাদি দিয়ে পুস্তকখানি পূর্ণাঙ্গ করতে আমায় সাহায্য করেন তো বড়ই কৃতজ্ঞ হব। এই কথাক'টি বলে আমি আজ বিদায় নিচ্ছি।

১৮ই আশ্বিন ১৩৫০,
কলিকাতা। } শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

মাতৃদেবীর স্মরণে

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

রায়গড়ের অধিষ্ঠাত্রী

রায়গড় লোকে লোকারণ্য। গান-বাজনা, ক্রিয়া-কাণ্ড, দান-ধ্যান, পূজার্চ্চনা—এ সবে মিলে রায়গড় এক অনুপম মূর্ত্তি ধারণ করেছে। দূর দূরান্তর থেকে গুণী, জ্ঞানী, মানী লোকেরা এখানে সমবেত। হিন্দু শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, হিন্দু ধর্ম্মচর্চ্চায় রত পণ্ডিত মনস্বী সাধু সন্তদের আজ এখানে অভাব নাই। সাধারণ প্রজাপুঞ্জও পল্লীর আবাস ছেড়ে পার্ব্বত্য রায়গড় দুর্গের আশেপাশে জড় হয়েছে। দেশী বিদেশী রাজপ্রতিনিধিরাও রায়গড়ে উপনীত। উৎসব বহুদিন যাবৎ চলেছে। সকলেই প্রধান উৎসব-দিনটির প্রতীক্ষায় রয়েছেন।

রায়গড়ে আজ কিসের উৎসব? পূর্ব্বেই দিকে দিকে ঘোষিত হয়েছে, মহারাষ্ট্রের অধিপতি, মরাঠা জাতির নবজীবন-দাতা ছত্রপতি শিবাজীর হিন্দু শাস্ত্রানুসারে যথা-রীতি রাজ্যাভিষেক হবে। তারই আনন্দে সকলে আজ মেতে উঠেছেন। কিন্তু কার প্রাণে সব চেয়ে বেশী আনন্দ ও অনুপম তৃপ্তি, তোমরা কেউ কি তা বল্‌তে পার? শিবাজীর? শিবাজীর পাটমহিষীর? পুত্র সম্ভাজীর? অমাত্যবর্গের? মরাঠাজাতির? না দানগ্রহীতা উপস্থিত পণ্ডিত ও শাস্ত্রীদের? তোমরা একে একে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে কতই না চেষ্টা করবে হয় ত। এখানে যাদের কথা বলা হ'ল তাঁদের মধ্যে কিন্তু তাঁকে খুঁজে পাবে না। তিনি নিরালায় শিবের মঙ্গল কামনা করতে করতে পূর্ণ অশীতি বর্ষে পদার্পণ করেছেন। তিনি তিল তিল করে নিজের জীবন ও শক্তি দিয়ে যে শিবকে গড়ে তুলেছেন সেই শিবের আজ অভিষেক-উৎসব! এতে যে কত আনন্দ, কত পরিতৃপ্তি তা তিনি ছাড়া আর কারো বুঝ্‌বার শক্তি নাই।

ইনি কে? পিতা শিবাজীকে পরিত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু মাতা কতই না দুঃখদৈন্যের মধ্যে তাঁকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন। তাঁর মনে আজ আনন্দ ধরে না।

গুরু রামদাস স্বামী ও মাতা জিজাবাঈর পদধূলি গ্রহণ করে শিবাজী সিংহাসনে উপবেশন করলেন। জিজাবাঈর ইহ জগতে আর কি কাম্য ? দীর্ঘজীবনে চরম দুঃখ ও সুখ তাঁর লাভ হয়েছে! তাই উৎসব সমাপ্ত হবার মাত্র বার দিন পরেই তিনি বাঞ্ছিত ধামে চলে গেলেন।

শিবাজীর কথা তোমরা ইতিমধ্যে হয়ত কিছু কিছু জেনেছ। শিবাজী সম্বন্ধে বড় বড় বইও আছে। তোমরা বড় হয়ে এ সব পড়লে তাঁর কত কীর্ত্তিগাথা জানতে পারবে। কিন্তু রায়গড়ের অধিষ্ঠাত্রী শিবাজী-মাতা জিজাবাঈর খবর কেউ বড় একটা রাখে না। বড় বড় যোদ্ধা, বিজেতা, রাজারাজড়ার কথাই লোকে জানে বা বলে, কিন্তু যাঁরা তাঁদের গড়ে তুলেছেন তাঁদেব খবর নেয় কে! তাঁদের বিষয় কেউ লিখে রাখেন নি, কাহিনী ও গাথার মধ্যে তাঁদের কথা যা-কিছু রয়ে গেছে। জিজাবাঈ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। তবু তাঁর সম্বন্ধে যতটুকু জানা গেছে তাই তোমাদের এখন বলব।

পাহাড় পর্ব্বত অরণ্যানীতে ভরা দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ভাগে মরাঠাদের বসতি। প্রথমে তাদের জীবিকা ছিল কৃষি ও গোচারণ। মধ্যযুগে দাক্ষিণাত্যে কয়েকটী

স্বাধীন মুসলমান খণ্ডরাজ্য স্থাপিত হলে মরাঠাদের অনেকে তাদের অধীনে সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করে। এ বিদ্যায় কেউ কেউ বিশেষ পারদর্শিতাও লাভ করেছিল। তখন আহ্‌মদনগর ও বিজয়পুরের খুব প্রতাপ। এদের প্রতাপের সম্মুখে মোগল শত্রুও কয়েক বার হার মেনে-ছিল। এ দুটি রাজ্যে অনেক মরাঠা নিজ কৃতিত্ব দেখিয়ে জায়গীরদার হন। মরাঠাদের কোন নেতা ছিল না। নিজেদের মধ্যে ঈর্ষা দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত। একারণ অনেকে বিপুল শৌর্য্য-বীর্য্যের অধিকারী হয়েও স্বাধীন-ভাবে তার কোন ফল দেখাতে পারেন নি।

সিন্ধ্‌রের লাখজী যাদব রাও আহ্‌মদনগর রাজ্যের একজন জায়গীরদার ছিলেন। তাঁরই কন্যা শিবাজী-মাতা জিজাবাঈ। জিজাবাঈর কুষ্ঠি ঠিকুজী ছিল কি না জানি না। তাঁর জন্মতারিখ সোজাসুজি কেউ বলে দিতে পারেন না। তাঁর মৃত্যু তারিখ থেকে তোমাদের হিসাব করে নিতে হবে। আগেই বলেছি, জিজাবাঈ মারা যান —শিবাজীর অভিষেক-উৎসব সম্পন্ন হবার মাত্র বার দিন পরে। ইংরেজী ১৬৭৪ সালের ৬ই জুন তারিখে ছত্রপতি শিবাজীর রাজ্যাভিষেক হয়, আর জিজাবাঈ মারা গেলেন এর বার দিন পরে ১৮ই জুন তারিখে। এখন

তোমরা জিজাবাঈর জন্ম তারিখ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিতে পার।

লাখজী যাদব রাও নিজামশাহী রাজ্যে যেমন একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলে গণ্য, মরাঠা সমাজেও তাঁর প্রতিপত্তি যথেষ্ট। তাঁর কন্যার সঙ্গে তাঁরই এক কর্ম্মচারীর পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব, সেও কি সম্ভব? এই কর্ম্মচারী পুত্রের সঙ্গেই কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁর কন্যার বিবাহ দিতে হয়েছিল! এর নাম শাহ্‌জী।

বিবাহাদির কথা বলার পূর্ব্বে শাহ্‌জীর কুলজীর কিছু অনুসন্ধান করা দরকার। মরাঠা জাতির ভোঁস্‌লে বংশে শাহ্‌জীর জন্ম। শাহ্‌জীর পিতামহের নাম বাবাজী। অন্যান্য মরাঠীদের মত বাবাজীরও জীবিকা ছিল কৃষিকর্ম্ম। বাবাজীর দুই পুত্র মালোজী ও ভিটোজী। তাঁরা কিন্তু পৈত্রিক ব্যবসা অবলম্বন করলেন না। সৈনিক হয়ে নিজেদের শক্তিমত্তা দেখাবেন এই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। তাঁরা স্বজাতীয় যাদব রাওয়ের অধীনে সৈনিকের কাজ নিলেন। এই কাজে কিছু কাল কাটে। এরই মধ্যে যাদব রাওর বাড়ীতে এক উৎসবের আয়োজন হ'ল। পুত্র শাহ্‌জীকে নিয়ে মালোজী তথায় গেলেন। শাহ্‌জী দেখতে খুব সুন্দর। যাদব রাও তাঁকে ও নিজ কন্যা জিজাবাঈকে

একত্রে কোলে নিয়ে রহস্য করে বল্‌লেন—এদের মধ্যে বিয়ে হলে কেমন হয়! মালোজী ভাবলেন, যাদব রাও বুঝি সত্যসত্যই বিবাহের কথা পেড়েছেন। তিনি অন্য সব অতিথিকে শুনিয়ে বল্‌লেন, জিজাবাঈ তাঁর পুত্রের সঙ্গে বাগ্‌দত্তা হলেন। কিন্তু এ যে অসম্ভব কথা! যাদব রাও নিজামশাহী রাজ্যের একজন বিখ্যাত জায়গীরদার, আর মালোজী তাঁর অধীনস্থ একজন সামান্য সৈনিক! যাদব রাও মালোজীর কথায় নিজেকে অপমানিত বোধ করে তৎক্ষণাৎ মালোজীকে কাজ থেকে বরখাস্ত করলেন।

এর পর মালোজী ভিটোজী দু' ভাই-ই পূর্ব্ব নিবাস এলোরায় ফিরে গেলেন। এলোরা পার্ব্বত্য ভূমি, কৃষিকর্ম্মের পক্ষে উপযুক্ত নয়। তথাপি তাঁরা অনন্যোপায় হয়ে এই কাজেই মন দিলেন। কথিত আছে, তাঁরা একদিন অকস্মাৎ মাটির মধ্যে অনেক ধনরত্ন পান। এরই সাহায্যে লোকজন অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে মালোজী ও ভিটোজী নিজ অঞ্চলে প্রভুত্ব স্থাপন করেন, ক্রমে নিজামশাহী রাজ্যেও তাঁদের বেশ প্রতিপত্তি হয়। আহমদনগর-রাজ নিজামশাহ তাঁদের ডেকে নিয়ে একটি সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন বা সর্দ্দার করে দিলেন। মালোজীর তখন খুবই পদোন্নতি হয়েছে। কন্যা জিজাবাইকে মালোজী-পুত্র

শাহ্জীর সঙ্গে বিবাহ দিতে যাদব রাওর আর কোন আপত্তি রইল না। শুভদিনে উভয়ের বিবাহ হয়ে গেল।

কিন্তু ভাগ্যদেবী জিজাবাঈর উপরে প্রথম থেকেই কেমন যেন অপ্রসন্ন ছিলেন। পিতা নিজামশাহী রাজ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি, শ্বশুরও সেখানে বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করেছেন, নিজ স্বামীরও যুবজনোচিত তেজস্বিতা ও সাহস প্রচুর। কিন্তু এত সবের মধ্যেও কোন্ পথ দিয়ে যেন সংসারে শনি প্রবেশ করলে। এই কথাই তোমাদের এখন বল্‌ব।

যাদব রাওর পূর্ব্বেকার ব্যবহার মালোজী ও শাহ্জীর পক্ষে ভুলে যাওয়া শক্ত ছিল। তথাপি যতদিন মালোজী জীবিত ছিলেন, দুই বৈবাহিক বা শ্বশুর-জামাতার মধ্যে মনোমালিন্য বা বিবাদ কোন রকমেই আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। মালোজী অনুমান ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর ভ্রাতা ভিটোজী তাঁর পদে অভিষিক্ত হলেন। ভিটোজী মারা গেলে তাঁর স্থান গ্রহণ করলেন মালোজীর পুত্র শাহ্জী।

কোন রাজ্যের পতন যখন আসন্ন হয় তখন নানাদিক থেকেই তার দেহে ঘুণ ধরে। আহ্মদনগরের প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ উপস্থিত হ'ল। শ্বশুর যাদব

রাও ও জামাতা শাহ্‌জীর মধ্যেও কলহের অন্ত ছিল না। যখন শক্তির প্রাধান্য লাভ নিয়ে দ্বন্দ্ব বাধে তার সম্মুখে পিতা-পুত্র, শ্বশুর-জামাতা কোন সম্পর্কই টেঁকে না। কি এদেশের কি বিদেশের সব ইতিহাসেই ঐ একই কথা। যাহোক্, শ্বশুর যাদব রাও ও জামাতা শাহ্‌জীর মধ্যে ঘোর দ্বন্দ্ব বেধে গেল। প্রবাদ এই, যাদব রাও নিজ কন্যা জিজাবাঈকে পর্য্যন্ত বন্দী করতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি! শাহ্‌জী পত্নীকে উদ্ধার করে পুণা জেলার উত্তর সীমায় শিউনির দুর্গে রেখে এলেন। তিনি তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে কোথায় নিয়ে যাবেন?—তখন তিনি যে যুদ্ধবিগ্রহে খুবই ব্যস্ত! যাদব রাও ইংরেজী ১৬৩০ সালে নিহত হলেন। শাহ্‌জী ভাবলেন তাঁর পথের কণ্টক এবারে দূর হ'ল!

এর দু' বছর পরে নিজামশাহ মারা গেলেন। ইতিমধ্যে শাহ্‌জী অন্তর্দ্বন্দ্বে বিচ্ছিন্ন আহ্‌মদনগরে খুবই প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বিজাপুর-রাজের সাহায্য নিয়ে ১৬৩৩ সালের আগষ্ট মাসে একজন বালককে নিজামশাহ খাড়া করলেন এবং তাঁরই নামে তিন বছর ধরে রাজদণ্ড পরিচালনা করতে লাগলেন। বলা বাহুল্য, এর ফলে ও-অঞ্চলে শাহ্‌জীরই প্রতিপত্তি বেড়ে গেল খুব।

তিনি বহু সহস্র নিজামশাহী সেনার সাহায্যে বিদর ও দৌলতাবাদ পর্য্যন্ত মোগল অধিকারগুলি উদ্ব্যস্ত করে তুল্‌লেন। মোগলরা কিন্তু এ সব সহ্য করতে পারলে না। তারা শাহ্‌জীর বিরুদ্ধে বিরাট্‌ বাহিনী প্রেরণ করলে, ১৬৩৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। পরবর্ত্তী অক্টোবর মাসে শাহ্‌জী হেরে গিয়ে মোগলদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। বালক নিজামশাহ্‌কে সাতটি দুর্গ সমেত মোগলদের হস্তে ছেড়ে দিতে হ'ল। শাহ্‌জী কিন্তু মোটেই বসে থাক্‌বার লোক নন্‌। তিনি এ পর বিজাপুরে গিয়ে কর্ম্ম গ্রহণ করলেন।

শাহ্‌জী যে সাতটী দুর্গ মোগলদের হস্তে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন তার মধ্যে শিউনির দুর্গ ছিল একটি। তোমরা আগেই জেনেছ,শাহ্‌জী জিজাবাঈকে সুরক্ষিত শিউনির দুর্গে রেখে যান। জিজাবাঈ বেশ কয়েক বছর এই দুর্গে অবস্থান করেছিলেন। শাহ্‌জী মধ্যে মধ্যে এখানে এসে জিজাবাঈর খোঁজ খবর নিয়ে যেতেন। জিজাবাঈর দুইটি পুত্রসন্তান হয়। জ্যেষ্ঠ অল্প বয়সেই মারা যান। দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয় এই শিউনির দুর্গে ১৬২৭ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে। এই পুত্রটি কে তা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝ্‌তে পারছ। ইনি আর কেউ নন্‌, আমাদের ছত্রপতি শিবাজী

মহারাজ। 'শিবাজী' নাম কেন হ'ল জান? জিজাবাঈর প্রথম পুত্র বিয়োগেব শোক তিনি ভুল্তে পাবেন নি। তাই স্থানীয় মন্দিরে শিবা-ভবাণীর নিকট তিনি আরাধনা করতে লাগ্লেন যেন গর্ভস্থ শিশু নির্ব্বিঘ্নে প্রসূত হয়। সন্তান নির্ব্বিঘ্নে ভূমিষ্ঠ হলে জিজাবাঈ এই দেবতার নামে নিজ সন্তানের নাম রাখলেন 'শিবাজী'।

শাহ্জীর কথা তো আগেই তোমাদের কিছু বলেছি। তিনি ছিলেন খুবই উচ্চাভিলাষী। এই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার পথে যিনিই বিঘ্ন হতেন তিনিই তাঁর বিষনজরে পড়তেন। তাই শ্বশুব যাদব রাওর সঙ্গেও তিনি শক্তির পরিক্ষা করতে কসুর করেন নি, এইমাত্র তোমরা তা জেনে নিয়েছ। আর এর পর থেকেই বোধ হয় আরম্ভ হ'ল জিজাবাঈর প্রতি শাহ্জীর বিরাগ। প্রথমে যাঁকে তিনি পিতার কবল থেকে উদ্ধার করেছিলেন, পিতার অন্তর্দ্ধানের পর তাঁর খোঁজখবর করা তিনি কর্ত্তব্য বলে আর গণ্য করলেন না। পত্নী জিজাবাঈ ও শিশু পুত্র শিবাজীকে পরিত্যাগ করে শাহ্জী তুকাবাঈ মোহিতে নাম্নী এক সুন্দরী কুমারীর পাণি-গ্রহণ করলেন। তাঁর গর্ভে ব্যাঙ্কোজী নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। উভয়কেই শাহ্জী কাছে কাছে

রাখতেন, যা-কিছু বিষয়-আশয় এঁদেরই তিনি মৃত্যুকালে দিয়ে যান।

তোমরা এখন নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করবে, তাহ'লে শাহ্‌জী কি জিজাবাঈ ও শিবাজী সম্বন্ধে কোন রকম ব্যবস্থাই করেন নি? এই কথাই তোমাদেব এখন বল্‌ব। কিছু পূর্ব্বে তোমাদের বলেছি, সন্ধির শর্ত্তস্বরূপ শিউনির দুর্গও শাহ্‌জীকে মোগলদের হস্তে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। জিজাবাঈ শিশুপুত্র শিবাজীকে নিয়ে এতদিন মনঃকষ্টে এখানে বাস করছিলেন। এখন এ আশ্রয় স্থলটুকুও পর হস্তে চলে গেল।

কতকটা নিজ বাহুবলে, কতকটা দুর্ব্বল নিজামশাহের নিকট থেকে জায়গীর আদায় করে শাহ্‌জী পুণা জেলায় নিজ কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আহ্‌মদ-নগর রাজ্য ছত্রভঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিজাপুরে চাক্‌রি নিয়ে যান। বিজাপুর খাস মহারাষ্ট্র হতে বেশ খানিকটা দূরে। কাজেই নিজ রাজ্যের দেখা-শোনার ভার তিনি দাদাজী কোণ্ড-দেব নামক একজন অভিজ্ঞ, সুচতুর ব্রাহ্মণের উপর দিয়ে গেলেন। শিউনির দুর্গ হস্তান্তর হলে শাহ্‌জী জিজাবাঈ ও শিবাজীকে পুণায় তাঁর নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করলেন। দাদাজীকে তিনি এই মর্ম্মে

লিখ্‌লেন, "আমার স্ত্রী জিজাবাঈ শিউনির দুর্গে অবস্থান করছেন। শিবাজী নামে তাঁর একটি পুত্র-সন্তান আছে। উভয়কেই শিউনির হতে পুণায় নিয়ে যাবেন। তাঁদের যা কিছু অর্থের প্রয়োজন আপনি তাঁদের তা দিবেন।"

জিজাবাঈ পুত্রসহ পুণায় যান ১৬৩৭ সালের প্রারম্ভে। প্রথমে পিতার দুর্ব্যবহার, পরে পতির তাচ্ছিল্য পতি-পরায়ণা জিজাবাঈর প্রাণে খুবই লেগেছিল। বিধাতার দান অমূল্যনিধি একমাত্র পুত্র শিবকে নিয়েই তাঁর এতদিন কেটে গেছে। শিউনির দুর্গে শাহ্‌জী ক্বচিৎ-কখন যদি-বা যেতেন, জিজাবাঈ পুণায় স্থানান্তরিত হওয়ায় এটুকু সম্ভাবনাও আর রইল না। নির্জ্জনে নিভৃতে পুত্রসহ একাকী বাস করতে হয়েছে তাকে দীর্ঘকাল। স্বামী দিনের পর দিন ধাপে ধাপে উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠ্‌ছিলেন, আর জিজাবাঈ নির্জ্জন প্রান্তরে দুর্গমধ্যে দীনতা ও বিষাদের মধ্যে কাল কাটাচ্ছিলেন। অদৃষ্টের কি বিড়ম্বনা! অথচ জিজাবাঈর এতটুকুও দোষ নাই। তিনি যে পুত্রের কল্যাণের জন্য শিবাভবাণীর শরণ নিয়েছিলেন, তাঁরই আরাধনায় অবশিষ্ট জীবন কাটাবেন স্থির করলেন। হিন্দুর ধর্ম্মে, শাস্ত্রে, দেবদেবীতে তাঁর ভক্তি অচলা হয়ে উঠ্‌ল।

রায়গড়ের অধিষ্ঠাত্রী

জিজাবাঈ শিবাজীর শৈশবসঙ্গিনী, খেলার সাথী। তাঁর কর্ম্ম, চিন্তা—এক কথায় সমগ্র জীবনখানিই যেন পুত্রের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। মা শিবাজীর নিকটে শুধ্ মা নন্, তিনি তাঁর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আর এই দেবী জ্ঞানেই তিনি পূজা পেয়ে এসেছেন। শিউনির দুর্গ থেকে তিনি যখন পুণায় এলেন তখন শিবাজীর বয়স মাত্র দশ বছর। অনাদৃতা মাতার দুঃখী সন্তানের শিক্ষার ব্যবস্থা কিরূপে করা হবে এই ছিল তাঁর ভাবনা। পুণায় এসে তাঁর এ ভাবনা কতকটা দূরীকৃত হ'ল।

জিজাবাঈ ও তাঁর কিশোর সন্তান শিবাজী দাদাজী কোণ্ডদেবের তত্ত্বাবধানে বাস করতে লাগলেন। শিবাজীর শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য শাহ্জীর কোন নির্দ্দেশ ছিল কি না আমরা তা জানি না। তবে দাদাজী কোণ্ড-দেব হয়ত এই দশম বর্ষীয় বালকের মধ্যে এমন কোন আশ্চর্য্য লক্ষণ দেখেছিলেন যার জন্যে তিনি তাঁর শিক্ষার আয়োজন করতে অতখানি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি শিবাজীর জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। শিবাজী মরাঠা সর্দ্দারের সন্তান। তাঁর উপযোগী শিক্ষা তো তাঁকে দিতে হবে। তাই শিবাজীকে যুদ্ধবিদ্যা, অশ্বারোহণ, এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় শেখাতে লাগ্লেন।

সে-যুগের শিক্ষা, বিশেষতঃ সর্দ্দার, সেনাপতি, বা রাজারাজড়ার সন্তানদের শিক্ষা অনেকটা ঐরূপই ছিল। তোমরা হয়ত জান্‌তে চাইবে, আজকাল শিক্ষা বল্‌তে আমরা যা বুঝি, সেই কেতাবী শিক্ষা শিবাজীকে দেওয়া হয়েছিল কি না। অর্থাৎ, এক কথায় শিবাজী কি লিখতে পড়তে শিখেছিলেন ? আজকাল একদল লোক অবশ্য প্রমাণ করতে চেষ্টা করছেন যে, শিবাজীর কেতাবী শিক্ষা খুব বেশী দূর অগ্রসর না হলেও তাঁর অক্ষর-জ্ঞান ছিল। কিন্তু এর প্রমাণের বড়ই অভাব। কেতাবী শিক্ষা না হলেও শিবাজীর তাতে কিছু ক্ষতি হয় নি। মাতা জিজাবাঈ, চারণ কবি ও বৃদ্ধদের মুখে হিন্দুর পুরাণ ও কাব্য থেকে বীরপুরুষদের জীবন কথা তিনি প্রায়ই শুন্‌তেন। আর এতেই তাঁর জীবনের প্রধান শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল।

যা হোক, পুত্র শিবাজী বাঞ্ছিত শিক্ষায় দিন দিন উন্নতি করায় মাতা জিজাবাঈ প্রাণে কতকটা সোয়াস্তি পেলেন। তোমাদের আর একটি কথা এখানে বল্‌ব। আমাদের শাস্ত্রে আছে, কিশোর বয়স সকল বয়সের সেরা। এই সময় তোমরা যা-কিছু দেখ, শোন, সকলই তোমাদের অজ্ঞাতসারেই মনে দাগ কেটে যায়। বই পড়ে আর আমরা কতটুকু জ্ঞান লাভ করি। আমরা আমাদের

পরিবেশ বা চারিদিক্‌কার দৈনন্দিন ব্যাপার থেকে যে জ্ঞান আহরণ করি, বই-পড়া জ্ঞান তার তুলনায় নিতান্তই সামান্য। শিবাজীর পক্ষে এই কথা খুব বেশী প্রযুজ্য।

দাদাজী কোণ্ড-দেবের উপর পুণা শাসনের ভার দিয়েই শাহ্‌জী নিশ্চিন্ত ছিলেন। তিনি বিজাপুরের কার্য্যে এমনি তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন যে, এদিকে কোন নজরই দিতে পারতেন না। দাদাজী নিজ বুদ্ধিবলে বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল পুণা অঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। পুণার পার্ব্বত্য প্রদেশেও তাঁর শাসনগুণে চাষ-আবাদ আরম্ভ হ'ল। হিংস্র জীবজন্তু প্রায় উচ্ছিন্ন হয়ে গেল। লোকজন শান্তিতে বাস করতে লাগ্‌ল। তাদের অবস্থাও অনেকটা ফির্‌ল। পুণা জায়গীরের আয় পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ হ'ল।

সে-যুগে যুদ্ধবিদ্যা জানা লোকের খুবই খাতির ছিল। শিবাজী খুব মন দিয়ে এই বিদ্যা আয়ত্ত করতে লাগলেন। কিন্তু দাদাজী কোণ্ড-দেবের সুদক্ষ রাজ্য-শাসনের আদর্শ তাঁর কিশোর মনে একটি বিশেষ ছাপ রেখে গেল। যার ফলে জীবনভর অত যুদ্ধবিগ্রহ করেও সুশাসনের ফলে নিজ রাজ্যের ও প্রজাপুঞ্জের সুখৈশ্বর্য্য তিনি দিন দিন বাড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন—একটা মরাঠা শক্তি গঠন করাও তাঁর

পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। জিজাবাঈ নিভৃতে দেবী ভবানীর নিকট যেমন প্রতিনিয়ত শিবাজীর কল্যাণ কামনা করতেন তেমনি তাঁর স্বাভাবিক গুণ ও শক্তির স্ফূরণের দিকেও তাঁর তীক্ষ্ণ নজর ছিল। পুত্রের উত্তরোত্তর উন্নতিতে তাঁর মনে কতই না আনন্দ হত।

ভবিষ্যতে শিবাজী যে জননায়ক হবেন তার লক্ষণ কৈশোরেই দেখা গিয়েছিল। যৌবনারম্ভেই তিনি বহু সৈন্য ও লোকজন জড় করে প্রতিবেশী বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ সুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁর যখন বিশ বৎসর বয়স তখন দাদাজী ইহলীলা সংবরণ করেন। তখন তিনি এতখানি শক্তিমান্ হয়েছেন যে, সহজেই পুণারাজ্য পরিচালনের ভার নিজ হস্তে নিয়ে নিলেন। দুঃখিনী জিজাবাঈর অদৃষ্ট এতদিনে বুঝি ফিরল। ভাবী রাজমাতা হওয়ার এই-ই সূচনা।

এর ঠিক এক বৎসর পরেই ১৬৪৮ সালে বিজাপুর-রাজ মহম্মদ আদিল শাহ্ শাহ্জীকে কারারুদ্ধ করেন। তখন শিবাজী পিতাকে কারামুক্ত করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে লাগ্লেন। তিনি দিল্লীর বাদশার দাক্ষিণাত্যের প্রতিনিধি বা বড়লাট মুরাদকে এ বিষয় হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ জানালেন। শাহ্জীর সঙ্গলাভ দূরে থাক্, তাঁর কোন

সাহায্যই তিনি এতদিন পান নি, পরেও তাঁর ভাগ্যে কোনরূপ সহযোগিতা জোটে নি বরং কখন কখন পিতার বিরোধিতাই তাঁর ভাগ্যে জুটেছে। তিনি পিতার বিপদে নিশ্চেষ্ট থাক্‌লেও থাকতে পারতেন; কিন্তু তা হবার নয়। সাধ্বী জিজাবাঈ পিতা পরমগুরু বলেই যে তাঁকে শিখিয়েছেন। শিবাজীর চেষ্টায় আর বিজাপুর-দরবারের কোন কোন মানী সভ্যের মধ্যস্থতায় আদিলশাহের মত বদলায় ও শাহ্‌জী কারামুক্ত হন। এর পর কিছুকাল শিবাজী বিজাপুর-রাজের বিরুদ্ধে আর অস্ত্র ধারণ করেন নি।

তবে তিনি কিন্তু এই ক' বছর যাবৎ বিরাট মোগল-শক্তির সঙ্গে যুঝে নিজ শক্তি পরখ করে নিয়েছিলেন। আওরংজেব স্বয়ং মোগলবাহিনী পরিচালনে নিয়োজিত ছিলেন। ১৬০৭ সালে সাজাহানের অসুখের বার্ত্তা ঘোষিত হলে আওরংজেব সসৈন্যে আগ্রার দিকে রওনা হন। তখন শিবাজী অনেকটা সোয়াস্তি পেলেন। ইতিমধ্যে বিজাপুর-রাজ আদিল শাহও মারা গেছেন। শিবাজী বিজাপুরের দিকেই আবার নজর ফেরালেন। বিজাপুর-সরকার শাহ্‌জীকে আদেশ দিলেন, তিনি তাঁর পুত্রকে যেন ঐরূপ হঠকারিতা থেকে নিরস্ত করেন।

শাহ্‌জী কিন্তু পুত্র শিবাজীর কার্য্যকলাপের কোন দায়িত্বই নিলেন না। তিনি বল্‌লেন—পুত্র তাঁর অবাধ্য, তাঁর মতামতের অপেক্ষা না রেখে বিজাপুর-সরকার শিবাজীর বিরুদ্ধে যে-কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করতে পারেন।

এর পরেই বিজাপুর-সরকার শিবাজী দমনে অগ্রসর হলেন। সেনাপতি আফজল খাঁকে পাঠান হ'ল একটা বড় সেনাদল নিয়ে। কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বে আপোষ-মীমাংসার আশায় আফজল খাঁ শিবাজীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রস্তাব করেন। এই আফজল-শিবাজী সাক্ষাৎ, উভয়ের উভয়কে আক্রমণ এবং আফ্‌জলের মৃত্যু ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা। এ সম্বন্ধে তোমরা পরে অনেক কিছু পড়বে। আফজল খাঁর মতলব মোটেই ভাল ছিল না। তিনিই শিবাজীকে আগে আক্রমণ করেছিলেন। শিবাজীও প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলেন, নচেৎ তাঁর কোন ক্রমেই রেহাই ছিল না। শিবাজী পূর্ব্বেই এ রকম ব্যাপার যে ঘটতে পারে তার খানিকটা আঁচ পেয়েছিলেন। সাক্ষাৎ করতে যাবার পূর্ব্বে মাতৃভক্ত শিবাজী মাতা জিজাবাঈর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করেছিলেন, তাঁরই আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে শিবাজী আফজল খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান।

শেষ পর্য্যন্ত শিবাজী ও বিজাপুর-সরকারের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হ'ল। এর মধ্যেই মোগল-সেনাও দুয়ারে এসে হানা দিলে। আওরংজেব পিতা শাজাহানকে বন্দী ক'রে ও ভ্রাতাদের নিধন করে ইতিপূর্ব্বেই দিল্লীর সিংহাসনে নিষ্কণ্টক হয়ে বসেছেন। বিরাট মোগল শক্তিকে বাধা দেওয়া শিবাজীর পক্ষে দুঃসাধ্য, তাই তিনি অন্যতম মোগল সেনাপতি রাজা জয়সিংহের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠালেন। উভয়ের মধ্যে যথারীতি সন্ধিও হ'ল। কিন্তু এখন সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। এ-ও তোমরা পরে বিশদ ভাবে জানবে। এই জয়সিংহেরই প্রস্তাবে শিবাজী আগ্রায় আওরংজেবের দরবারে গিয়েছিলেন। উভয়ে উভয়কে ভাল করেই জানতেন, কাজেই কেউ কাউকে বিশ্বাস করলেন না। আগ্রা গমনের পূর্ব্বে শিবাজী কোন অমঙ্গল আশঙ্কা করেছিলেন কি-না জানি না, তবে তিনি অনুপস্থিত কালের নিমিত্ত রাজ্য-শাসনের সব বিধি ব্যবস্থা করে যান। মাতা জিজাবাইকে করলেন তাঁর রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্রী। পুত্রের অনুপস্থিতি কালে তাঁরই চেষ্টা-উদ্যোগে শিবাজী-প্রবর্ত্তিত শাসন-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ ছিল। আগ্রায় পুত্রের বন্দীপ্রায় জীবন যাপনের কথা শুনেও তিনি ধৈর্য্য হারান নি। তিন মাস পরে

সন্ন্যাসী বেশে শিবাজী এসে প্রথমে মাতার নিকটেই আত্মপরিচয় দিলেন।

এর পরবর্ত্তী ব্যাপারগুলি তোমরা আগেই জেনেছ। জিজাবাঈর ধর্ম্মপ্রবণতা পুত্রে ষোল আনাই বর্ত্তে ছিল। গো, ব্রাহ্মণ, নারী—এই তিনেব সম্মান শিবাজী মায়ের নিকট হতেই শিখেছিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম্ম বা হিন্দু-রাজ্য প্রতিষ্ঠার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে আসরে নামেন নি, কিন্তু তিনি যখন শক্তিমান্ হলেন তখন এই জন্যই তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয়েছিল। এর মূলে রয়েছে মাতা জিজাবাঈর শিক্ষা।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ দম্পতি

দাম্পত্য জীবনেব স্নুখ সম্ভোগ করা জিজাবাঈর ভাগ্যে ঘটে নি। বীর পুত্র ছত্রপতি শিবাজী বয়ঃপ্রাপ্ত হলে মাতাব এ দুঃখ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছিলেন, এবং সর্ব্ব শক্তি দিয়ে মায়েব সেবা কবে নানা ভাবে তাঁর এ দুঃখ ঘুচাতে চেষ্টা কবেছিলেন। মাতৃলব্ধ শিক্ষা ও প্রেরণা বশে তিনি দক্ষিণ ভারতে একটি হিন্দু বাজ্যও প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন। এবাবে তোমাদের এমন এক দম্পতির কথা বল্‌ব, যাবা ছিলেন বিদেশী, মূলতঃ ইংলণ্ডেব অধিবাসী; কিন্তু পরে আমেরিকা-প্রবাসী হয়েছিলেন। তাঁদের পুত্রও দেশবিদেশে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ কূটনীতিবিদ্ আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের অন্যতম হোতা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানে নব পথ প্রদর্শক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পিতা-মাতার কথাই তোমাদের এখন বল্‌তে যাচ্ছি। তাঁরা উভয়েই দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন। পিতার মৃত্যু হয় উননব্বই বছর বয়সে ইংরেজী ১৭৪৪ সালে; এর ঠিক আট বছর পরে পঁচাশী বছর বয়সে তাঁর মাও ইহধাম ত্যাগ করেন। পুত্র ফ্রাঙ্কলিন শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে তাঁর

পিতামাতার সমাধির উপর প্রস্তরফলকে এই মর্ম্মের কথাগুলি উৎকীর্ণ করিয়েছেন,—

"জোসিয়া ফ্রাঙ্কলিন ও তাঁর স্ত্রী আবিয়ার এই সমাধি-স্থল। তাঁরা পঞ্চান্ন বছর প্রীতিপূর্ব্বক দাম্পত্য জীবন যাপন করেছিলেন। তাঁদের কোন সম্পত্তি ছিল না, মোটা মাহিনার চাক্‌রিও তাঁরা করেন নি; শুধু নিয়ত শ্রম, অধ্যবসায় আর ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ—এই তিন সম্বল ক'রে তাঁরা বৃহৎ পরিবার স্বচ্ছন্দ ভাবে প্রতিপালন করেছিলেন। তেরটি পুত্র কন্যা ও সাতটি নাতি-নাতনীর ভরণপোষণের ভার ছিল তাঁদের উপর। পাঠক, এই দৃষ্টান্ত থেকে তোমার নিজ কার্য্যে শ্রম করতে উদ্বুদ্ধ হও, আর ভগবান্‌কে অবিশ্বাস ক'র না। পিতা—তিনি সত্যসন্ধ ও হিসাবী লোক ছিলেন। মাতা—তিনি ছিলেন সদ্বিবেচক ও ধর্ম্মপরায়ণা নারী। কনিষ্ঠ পুত্র তাঁদের স্মৃতির প্রতি নিজ ভক্তি-শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য এই প্রস্তরখণ্ড স্থাপন করে। জোসিয়া ফ্রাঙ্কলিন—জন্ম ১৬৫৫ সাল, মৃত্যু ১৭৪৪, বয়স ৮৯; আবিয়া ফ্রাঙ্কলিন—জন্ম ১৬৬৭, মৃত্যু ১৭৫২, বয়স ৮৫।"

এই উৎকীর্ণ লিপি থেকে ফ্রাঙ্কলিন-দম্পতির জীবনের মূল কথাগুলি তোমরা শুন্‌লে। আমি এঁদের সম্বন্ধে যে খুব বেশী কিছু বলতে পারব তা নয়। আবিয়া সম্বন্ধে

তো এর বেশী কিছুই প্রায় জানা যায় না। পুত্র ফ্রাঙ্কলিনও তাঁর অমূল্য আত্মজীবনীতে মাতা সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চবাচ্য করেন নি। তবে পিতা, পিতৃকুল ও মাতৃকুল সম্বন্ধে কিছু কিছু লিখে গেছেন। তাই থেকেই বুঝা যায় এই উভয় বংশ কিরূপ কর্ম্মঠ, পরিশ্রমী, স্বাধীনতাপ্রিয় ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিল। তোমাদের এই কথাই এখন বল্‌ব।

বহির্জগতের নিকট আমেরিকা তখন সম্পূর্ণ নূতন দেশ। ইউরোপবাসীরা তাদের সুবিধার জন্য এদেশের পূর্ব্বেকার অধিবাসীদের নাম দেয় রেড ইণ্ডিয়ান বা লোহিত ভারতবাসী। এদের ইণ্ডিয়ান নাম দেওয়া হ'ল কেন জান? আমাদেরই ভারতবর্ষের অতুল ধন-ঐশ্বর্য্যের কথা শুনে এর সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য ইউরোপবাসীরা মধ্যযুগে খুবই লালায়িত হয়েছিল। সেই সময়ে ক্রিষ্টোফার কলম্বাস নামে এক বিখ্যাত নাবিক জলপথে ভারতবর্ষের দিকে রওনা হন। কিন্তু তিনি পথ ভুলে সম্পূর্ণ একটি নূতন দেশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি ভেবেছিলেন ভারতবর্ষেই পৌঁছেছেন। তাই এর নাম দিলেন ইণ্ডিয়া। এর কয়েক বছর পরেই তাঁর এ ভুল ধরা পড়ে। তাই সত্যকার ভারতবর্ষ আবিষ্কৃত হলে তখন ওদেশের নাম দেওয়া হ'ল ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বা 'পশ্চিম

ভারতবর্ষ'। এই পশ্চিম ভারতবর্ষ বা নবাবিষ্কৃত দেশটিই পরে আমেরিকা নামে অভিহিত হয়। এরই আদিম অধিবাসী ঐ রেড ইণ্ডিয়ান। পশ্চিমের লোকেরা এই রেড ইণ্ডিয়ানদের যতই হিংস্র বর্ব্বর বলে চিত্রিত করুক না কেন, আসলে তারাও এক কালে খুবই সভ্য শক্তিমান্ ছিল। কিন্তু কালক্রমে নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তারা তুর্ব্বল হয়ে পড়ে। আমেরিকায় যখন প্রথম ইউরোপ বাসীরা যেতে লাগল তখন পূর্ব্ব সভ্যতা গর্ব্বে গর্ব্বিত রেড ইণ্ডিয়ানরা তাদের খুবই বাধা দিয়েছিল।

প্রথম দিকে খুবই যুদ্ধ বিগ্রহ করে ইউরোপীয়দের আমেরিকার অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করতে হয় বটে, কিন্তু তাদের নবাবিষ্কৃত অস্ত্রশস্ত্র, রণকৌশল, বুদ্ধিচাতুর্য্য ও নূতন দেশ অধিকারের তুর্দ্দম আকাজ্ক্ষার সম্মুখে আদিম অধিবাসীরা বেশী দিন দাঁড়াতেই পারলে না। শেষ পর্য্যন্ত রণে ভঙ্গ দিয়ে বিদেশীদের সঙ্গে তাদের একটা আপোষ-রফা করে নিতে হয়েছিল। তখনও মধ্যে মধ্যে এখানে সেখানে যে খণ্ড যুদ্ধ হত না তা নয়, তবে মোটের উপর সেখানে শান্তিই বিরাজ করত।

খ্রীষ্টধর্ম্মের তুইটি প্রধান শাখা—রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট। দীর্ঘ দিন এই উভয় দলে দ্বন্দ্ব-কলহ লেগেই

ছিল। কোন অঞ্চলের রাজা রোমান-ক্যাথলিক হলে, সেখানকার প্রোটেষ্টাণ্টদের অশেষ দুর্গতি। আবার কোন প্রদেশের অধিকারী প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের হলে অন্য সম্প্রদায়ের লাঞ্ছনার অবধি থাকত না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধীনতা—তখনকার ইউরোপে এরূপ কোন কথাই ছিল না। কাজেই ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে লোকদের খুবই নির্যাতীত হতে হত।

দীর্ঘকাল দ্বন্দ্বের পর বিলাতে প্রোটেষ্টাণ্ট শাখাই রাজ-ধর্ম্ম বলে গৃহীত হয়। তখন রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে অন্য শাখার বহু অধিকার সঙ্কুচিত হয়ে যায়। ক্রমে প্রোটেষ্টাণ্টদের মধ্যেও বহু উপদল বা শাখার সৃষ্টি হয়। নিজ নিজ স্বাধীন ধর্ম্মমত পোষণের জন্য তাদেরও খুব নির্যাতন ভোগ করতে হ'ত। বিলাতেই যে শুধু এরূপ হত তা নয়, ইউরোপের অন্যান্য দেশেও প্রোটেষ্টাণ্ট উপশাখা-গুলির দুঃখের অন্ত ছিল না। তারা তাই স্বদেশে লাঞ্ছনা ভোগের চেয়ে দূরে কোথাও গিয়ে শান্তি লাভ করতে বিশেষ উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠে।

নবাবিষ্কৃত আমেরিকায় তখন অনেকটা শান্তি স্থাপিত হয়েছে, কাজেই এই দেশটির দিকেই তাদের দৃষ্টি পড়ল বেশী করে। প্রিয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করে নিজ নিজ

স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য তারা দলে দলে ঐ অজানা দেশের দিকে ছুট্‌ল। আমেরিকা বিরাট্‌ ভূখণ্ড, মহাদেশ। আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানরা তার কতটুকুই বা ভোগ করেছে। এ দেশটী আন্‌কোরা নূতন, যেমন উর্ব্বরা তেমনি প্রাকৃতিক ধনসম্পদে পূর্ণ। কিন্তু এসকল আহরণের উপযোগী বিদ্যা বা সাজসরঞ্জাম ঐ সব গৃহ-পরিত্যক্ত বা বিতাড়িত লোকদের খুব কমই ছিল, কাজেই প্রথম প্রথম তাদের অনেককেই বহু কষ্টে জীবিকার সংস্থান করতে হ'ত।

ফ্রাঙ্কলিন পরিবার বেশী দিন আমেরিকায় পদার্পণ করেন নি। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের পিতাই তাঁদের পরিবারে সর্ব্বপ্রথম আমেরিকায় গিয়ে বসতিস্থাপন করেন। জোসিয়া ফ্রাঙ্কলিন ও অন্যান্য অনেকে প্রচলিত রাজকীয় প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মে আস্থা হারিয়েছিলেন। কিন্তু নিজ মত অনুযায়ী চল্‌লে অশেষ দুঃখ পেতে হত তাদের। পূর্ব্ববর্ত্তীদের এবং তখনকারও অগ্রসর প্রোটেষ্টাণ্টদের দুঃখ-ভোগ তাঁরা ভুলে যান নি। তাই তাঁরা একদল স্বদেশ ছেড়ে আমেরিকার নিউ ইংলণ্ডে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। নিউ ইংলণ্ড তাঁদের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন দেশ। কাজেই জীবিকার সংস্থান করতে তাঁদের বিশেষ বেগ পেতে হ'ল।

কিন্তু এ কষ্ট তাঁদের নিকট কষ্ট বলেই বোধ হ'ল না। তাঁরা যে তাঁদের স্বাধীন ধর্ম্মমত বিসর্জ্জন দিয়ে প্রচলিত ধর্ম্মের দাস হয়ে পড়েন নি এই বিশ্বাসই নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যে তাঁদের বাঁচিয়ে রেখেছিল। স্বধর্ম্মে অবিচলিত থেকে তাঁরা নিজ সংসারধর্ম্মও পালন করেছিলেন। এই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা তাঁদের সন্তান-সন্ততির মধ্যেও বিশেষরূপে অনুক্রামিত হয়। রাজনীতি ক্ষেত্রে যে আমেরিকাবাসীরা স্বাতন্ত্র্য লাভ করে তার মূলে রয়েছে তাদের পিতৃপিতামহের এই স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা।

জোসিয়া ফ্রাঙ্কলিনের পৈত্রিক-ব্যবসা কর্ম্মকার বৃত্তি। নূতন দেশে এ বৃত্তি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করলেন না। এর আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জামই বা এই নূতন দেশে কেমন করে মিল্‌ত! তাই তাঁকে এ বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে সাবান তৈরির কাজেই মন দিতে হ'ল।

বিলাতে অবস্থান কালে অল্প বয়সেই ইংরেজী ১৬৮২ সালের কাছাকাছি জোসিয়া ফ্রাঙ্কলিনের বিবাহ হয়। তিনি যখন স্বদেশ ছেড়ে নিউ ইংলণ্ডে বসতি স্থাপন করেন তখন তাঁর তিনটি সন্তান। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে জোসিয়ার আরও চারটি সন্তান জন্মে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি

দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করেন। এই স্ত্রীরই গর্ভে স্বনাম-খ্যাত বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের জন্ম হয়। এই স্ত্রীর গর্ভে দশটি সন্তান হয়। এই বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণের ভার নিতে হয়েছিল স্বল্প-আয়ী জোসিয়াকে।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের মাতা আবিয়ার বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না--গোড়াতেই তোমাদের বলেছি। কিন্তু তাঁব জন্মও হয়েছিল এই রকম এক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় পরিবাবে। আবিয়ার পিতা পিটার ফল্‌জার খুব ধর্ম্মপ্রাণ লোক ছিলেন। নিজ বিবেকবুদ্ধি মত ধর্ম্ম অনুশীলন করার জন্য তিনিও স্বদেশ পরিত্যাগ করে এই নিউ ইংলণ্ডে এসে বসতি স্থাপন কবেছিলেন। ধর্ম্মপ্রাণ পিটারের কবি-প্রতিভাও কম ছিল না। স্বদেশ পরিত্যাগের পূর্ব্বেই তিনি বহু কবিতা লিখেছিলেন। একটি বড় কবিতা তিনি পুস্তকাকারে ছাপিয়েও ছিলেন। এই কবিতাটি থেকেই পিটারেব মনোভাব বুঝা যায়। ব্যাপটিষ্ট, কোয়েকার ও অন্যান্য অত্যগ্রসর প্রোটেষ্টাণ্ট শাখাগুলির উপর অত্যাচার, রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে সংগ্রাম ও বহুরকমের বিপৎপাত এ সব কবিতার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছিল। তিনি এতে এই কথাই বিশেষ করে বলেন যে, "ধার্ম্মিক ব্যক্তিদের নির্যাতনের ফলেই ঈশ্বর এর দণ্ড স্বরূপ ইংলণ্ডকে ঐ সব

বিপদের মধ্যে ফেলেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে যে সকল নিদারুণ আইন বিধিবদ্ধ করা হয়েছে তা অবিলম্বে রদ করা উচিত।” যাঁর মনোভাব এইরূপ তিনি কি আব বেশী দিন ধার্ম্মিক-নির্যাতনকারী ইংলণ্ডে থাক্‌তে পারেন —হোক্‌ না সে পিতৃভূমি? তিনিও বিবেকবুদ্ধির জয় ঘোষণা করে নিউ ইংলণ্ডে চলে এসেছিলেন। এইরূপ পিতার কন্যা আবিয়া। আবিয়াও পিতার ন্যায় ধর্ম্মপবায়ণা, তেজস্বিনী ও কষ্টসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন।

জোসিয়া ও আবিয়া ফ্রাঙ্কলিনের বৃহৎ পরিবাব। সন্তান-সন্ততিদের মুখে দু-বেলা দু-মুঠো অন্ন দেওয়ার জন্য তাঁদের অহর্নিশি হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাট্‌তে হত। তখন ওদেশে উচ্চ শিক্ষাব তেমন বন্দোবস্ত ছিল না। আর জোসিয়া তাঁর পুত্রকন্যাদের উচ্চ শিক্ষা দিবার কথা কল্পনাও করতে পারতেন না। বড় জোর পাঠশালার শিক্ষা দিয়েই নিজের কাজে সাহায্য করাব জন্য তাঁদের টেনে আনতেন। একটু আগেই বলেছি, পৈত্রিক বৃত্তি অবলম্বনের সুযোগ না থাকায় জোসিয়া নূতন দেশে গিয়ে সাবান তৈরিতে মন দিয়েছিলেন। মোমবাতি ও সাবান এই দুটি জিনিষ তিনি তৈরি করতেন। যাতে বেশী কিছু তৈরি করা যায় এজন্য কচি ছেলে মেয়েদেরও

এ কাজে লাগাতেন! বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন তাঁর সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। তাঁকেও তিনি বেশী দিন শিক্ষায় ব্যাপৃত রাখতে পারেন নি। তাঁর যখন বয়স দশ বছর তখনই তাঁকে এনে এই কাজে লাগিয়ে দিলেন।

কোন্ পিতা-মাতা পুত্র-কন্যাদের উচ্চশিক্ষা না দিতে চান? জোসিয়া ও আবিয়ার খুবই ইচ্ছা ছিল যে, সন্তানদের মধ্যে অন্ততঃ একজনও উচ্চ শিক্ষা লাভ করে। জ্যেষ্ঠ পুত্রদের তো উচ্চশিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়নি, ভাবলেন—সর্ব্ব কনিষ্ঠ বেঞ্জামিনকে তাঁরা ভাল রকম লেখাপড়া শেখাবেন। বেঞ্জামিনের যখন আট বছর বয়স তখন তাঁরা তাঁকে একটি লাটিন স্কুলে ভর্ত্তি করে দেন। জোসিয়ার প্রথমে ইচ্ছা হয়—এই পুত্রটিকে যথোচিত শিক্ষা দিয়ে পাদ্রীর কাজে নিযুক্ত করবেন। পুত্র এইরূপে ধর্ম্মচর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করে পরিবারের কল্যাণ সাধন করবেন। কিছুদিন পরে জোসিয়ার মত বদলাল। তিনি তাঁকে সাধারণ পাঠশালায় ভর্ত্তি করে দিলেন। এই স্কুলে বেঞ্জামিন লেখা ও অঙ্ক শিখ্তেন। এই স্কুল তাঁর বড়ই ভাল লেগেছিল। এর শিক্ষক ছিলেন জর্জ্জ ব্রাউনওয়েল। তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল বড় সুন্দর।

বেঞ্জামিন বলেন যে, এখানে হু' বছর পড়ার পরই পিতা তাঁকে স্কুল ছাড়িয়ে নিজ ব্যবসায়ে নিযুক্ত করতে বাধ্য হলেন। পিতা কতখানি ঠেকা হলে সর্ব্বকনিষ্ঠ কচি সন্তানকে পড়া ছাড়িয়ে নিজ কাজে লাগাতে বাধ্য হন তা তোমরা হয় ত বুঝবে না; কিন্তু এতে জোসিয়া ও আবিয়ার প্রাণে খুব লেগেছিল। কিন্তু তারা নিরুপায়। অত বড় পরিবার প্রতিপালনের ভার যে তাঁদের উপর। বেঞ্জামিন লিখেছেন যে, তাঁকে মোমবাতির জন্য সল্‌তে কাট্‌তে হত, গলা মোম ঢেলে নিয়ে আকার মাফিক করে সাজাতে হত। তিনি অনেক সময় দোকানেও বসতেন, আবার কখন কখন সংবাদাদি দেওয়ার জন্য অন্যত্রও যাতায়াত করতেন। বেঞ্জামিনের বয়স অল্প, দোকানে বেশীক্ষণ বসে থাক্‌তে চপল বালকের ভাল লাগবে কেন? তাঁর এ কাজ মোটেই পছন্দসই ছিল না। বোষ্টন সহর সমুদ্রের তীরে। প্রতি দিন কত জাহাজ দূর দূরান্ত থেকে আসে আবার চলে যায়, কত নাবিকের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়! বেঞ্জামিন ভাবলেন তিনি নাবিক হয়ে দূরে সমুদ্র পারে চলে যাবেন, কত দেশ—কত লোক্ দেখবেন। বালসুলভ কল্পনা কোন্ অজানা রাজ্যে তাঁকে নিয়ে যেত।

বেঞ্জামিনেব সমগ্র কৈশোর পিতার নিকট কাটে। পিতাব আশ্রয়ে যতদিন ছিলেন তাঁর পড়া শুনা তত দিন তেমন কিছুই হয় নি। অগ্রজ জেম্‌সের এক ছাপাখানা ছিল। এই ছাপাখানা থেকে 'নিউ ইংলণ্ড কুরাণ্ট' নামে একখানি সংবাদ পত্র বের হত। ফ্রাঙ্কলিন এই ছাপাখানায় কম্পোজিটরি শিখে এই কাজেই লেগে যান। শৈশব থেকেই তাঁর পড়াশুনার প্রতি ঝোঁক, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেই জ্ঞান-পিপাসা আরও বেড়েই চল্‌ল। ছাপাখানার কাজের ফাঁকে ফাঁকে বেঞ্জামিন বই পড়তেন। ক্রমে তাঁর লেখার হাত এল। কাগজে তিনি বেনামিতে লেখা দিতেন। লেখা কর্ত্তৃপক্ষের এত ভাল লাগত যে, লেখকের নাম না জানলেও লেখার গুণে, তা পত্রিকায় স্থান পেত। অগ্রজ যখন জান্‌তে পারলেন যে, বেঞ্জামিনই বেনামিতে এই সব লেখা দিয়ে থাকেন তখন তাঁর মনে কেমন একটা বিরূপ ভাব দেখা দিল। ফলে তাঁর সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় বেঞ্জামিন এ কাজ ছেড়ে দিলেন।

বেঞ্জামিনের পরবর্ত্তী জীবন একজন দুঃসাহসিক যুবকের জীবন যেমন্ হয়ে থাকে ঠিক তেমনি। তিনি সামান্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করে পিতৃপুরুষের দেশ ইংলণ্ডে যান। সেখানে গিয়ে খুবই অর্থকষ্টে পড়েন। কিন্তু ছাপাখানার

কাজ তাঁর জানা। এই বিদ্যাই বিপদে তাঁর পরম সহায় হ'ল। তিনি কিছুকাল বিলাতে ছাপাখানায় কাজ করে স্বদেশে ফিরে আসেন। তিনি প্রথম কিছুদিন অপরের ছাপাখানায় কর্ম্ম ক'রে নিজেই একজন সঙ্গীব সহযোগে একটি মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করেন এবং সেখান থেকে 'পেন্‌সিল-ভানিয়া গেজেট' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।

এই সময় থেকেই তাঁর খ্যাতি আরম্ভ হয়, তখনও আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হয় নাই। ইউরোপে ইংলণ্ড ও ফরাসীর মধ্যে ইংরেজী ১৭৫৪ সালে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন আমেরিকাবাসীরা একটি সম্মেলনে সমবেত হয়ে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, ফ্রান্সের সঙ্গে সার্থক ভাবে যুঝতে হলে ইংরেজ রাজের পক্ষে আমেরিকাকে একটি স্বশাসিত রাষ্ট্রে পরিণত করা দরকার। ইংরেজ ও মার্কিন সেনানী আমেরিকায় এই ভাবী রাষ্ট্রের অধীন থেকেই শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবে। এই প্রস্তাবের রচয়িতা কে জান? তিনি জোসিয়া ও আবিয়া ফ্রাঙ্কলিনের পুত্র এই বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন।

তখন পর্য্যন্ত আমেরিকা স্বাধীন হবার কিন্তু কল্পনাও করে নি। পরে ব্রিটিশ সরকারের দুর্ব্যবহারে আমেরিকার

উপনিবেশগুলি যখন একটি রাষ্ট্রে পরিণত হবার উপক্রম হ'ল তখনও তাতে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের কৃতিত্ব ছিল যথেষ্ট। তিনি প্রথমে ইংলণ্ডে আমেরিকাবাসীর দূত হয়ে যান এবং ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ও ইংরেজ জাতিকে কদর্য্য আইনগুলি তুলে নিয়ে আমেরিকাবাসীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে সানুনয় অনুরোধ করেন। পরে যখন দেখলেন, ইংরেজরা প্রতিজ্ঞায় অটল, তখন তিনি দেশে ফিরে এলেন।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন সাংবাদিক, বহু ভাষাবিৎ, বৈজ্ঞানিক। তাঁর সমাদর ইংলণ্ডে যতটা হয়েছিল, তার বেশী হয়েছিল ইউরোপের ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে। তাই পিতৃভূমি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যখন আমেরিকাবাসীরা যুদ্ধে লিপ্ত হ'ল তখন ফরাসীদের সাহায্য লাভের জন্য বেঞ্জামিনই যুদ্ধরত আমেরিকার প্রথম দূত হয়ে ফ্রান্সে গেলেন। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে ফরাসী জাতির সাহায্য ও কৃতিত্ব ছিল প্রচুর। আর বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের সুদক্ষ দৌত্য কার্য্যের ফলেই এটা সম্ভব হয়ে উঠে।

জোসিয়া ও আবিয়ার এই কৃতী সন্তান রাষ্ট্রে বড় বড় পদ ও খ্যাতিলাভ করেও নিঃসম্বল পিতামাতার প্রতি বরাবর ভক্তিমান্ ছিলেন। তাঁর কেতাবী বিদ্যা অর্জ্জন

তাঁদের কাছ থেকে হয় নি বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে তিনি যে এতখানি কৃতিত্ব লাভ করেছিলেন তা তাঁর পিতামাতারই শিক্ষাগুণে। তাঁর জীবন ও কর্ম্মের উপর তাঁর পিতার প্রভাব পড়েছিল খুব। বেঞ্জামিন তাঁর আত্মচরিতে পিতার একটি শিক্ষার কথা এইরূপ লিখে গেছেন—"পিতা পুত্র-কন্যাগণসহ একই টেবিলে বসে আহার করতেন। আহারের সময় এমন সব কৌতুককর গল্প করতেন যার ফলে আমাদের মনের উৎকর্ষ হত যথেষ্ট। ছোট বড় সকলেই আমরা ভোজন করতে করতে একমনে এই সব গল্প শুনতাম। আমাদের অজ্ঞাতসারেই কখন খাওয়া শেষ হয়ে যেত; কিন্তু তাঁর গল্পের ফোয়ারা বন্ধ হত না। দিনের পর দিন সকাল সন্ধ্যা আহারের সময় আমাদের এই ভাবেই কেটেছে। এতে আমার এক মহদুপকার হয়েছে। যা' সৎ, ন্যায্য এবং জীবন-যাপনে একান্ত দরকার সেই দিকেই আমাব দৃষ্টি নিয়ত নিবদ্ধ থাকৃত,—আমরা কি আহার করলাম, আহার্য্য রান্না কিরূপ হ'ল, ভাল কি মন্দ, স্বাদু কি বিস্বাদ, এটা ভাল কি ওটা মন্দ এরূপ আলোচনা করার অবকাশই হ'ত না। শৈশব ও কৈশোরে সেই যে আমার অভ্যাস হয়েছে তা এখনও বলবৎ আছে। আহারের সময় ভোজ্য দ্রব্যের

প্রতি আমার এতই অমনোযোগ যে, কি আহার করলাম তা আধ ঘণ্টা পরে আর বল্‌তে পারব না।”

বেঞ্জামিন বলেন, তাঁর পিতামাতা উভয়েরই স্বাস্থ্য অটুট ছিল। যে ব্যাধিতে তাঁদের মৃত্যু হয় তা ছাড়া তাঁদের অন্য কোন ব্যাধি হতে তিনি দেখেন নি। পিতা জোসিয়ার দেহ ছিল দীর্ঘ, সুগঠিত ; তিনি ছিলেন শক্তিধর অথচ কৌশলী পুরুষ। অত কঠোর পরিশ্রমের মধ্যেও তিনি সময় করে সঙ্গীত বিদ্যার চর্চ্চা করতেন। তাঁর স্বরও ছিল মিষ্ট। দিনের কার্য্যের পর তিনি যখন বীণা সহযোগে ঈশ্বর-স্তোত্র গান করতেন তখন তা বড়ই মধুর শোনাত। দশের কার্য্যে তিনি কখনও যোগ দিতে পারেন নি, তবে ও অঞ্চলে যখনই কোন কঠিন সমস্যা দেখা দিত তখনই তাঁর পরামর্শ লওয়া হত। অধিবাসীরা তাঁকে খুবই প্রীতিশ্রদ্ধা করত।

স্থিতপ্রজ্ঞা নারী

জর্জ্জ ওয়াশিংটনের নাম তোমরা অনেকেই হয়ত শুনেছ। তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সভাপতি। একটু আগেই ইংরেজদের সঙ্গে আমেরিকাবাসীর বিবাদের কথা তোমাদের বলেছি। এই বিবাদ যুদ্ধে পর্য্যবসিত হয়। আর এ যুদ্ধ ক্রমেই ঘোরতর আকার ধারণ করে। দীর্ঘ সাত বছর যুদ্ধ চলার পর তবে এর নিবৃত্তি হয়। ইংরেজ ও আমেরিকাবাসীদের মধ্যে একটা সন্ধি স্থাপিত হ'ল। এই সন্ধির ফলে আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশ-গুলি একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হ'ল ও সর্ব্বপ্রকারে স্বাধীনতা লাভ করল।

ওয়াশিংটন এই স্বাধীনতা-যুদ্ধে সেনাধ্যক্ষের কাজ করেছিলেন। তাঁর রণ-কৌশল ও সৈন্য-পরিচালনার গুণে আমেরিকা স্বাধীন হয়। দীর্ঘকাল কত বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয়েছে তাঁকে। জয়-পরাজয়ের মাঝখানে কত দিন তাঁর চিত্ত সন্দেহ-দোলায় আলোড়িত হয়েছে। তাঁর আকৃতি প্রকৃতিতে এর ছাপ কতই না সুস্পষ্ট।

বিজয় মাল্যে ভূষিত হয়ে তাঁর প্রধান কাজ হ'ল

গর্ভধারিণী জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। এই যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে তিনি তাঁর মাতাকে ফ্রেডারিক্স বার্গ নামে একটি নিবাপদ স্থানে রেখে এসেছিলেন। মাতা তখন সেইখানেই রয়েছেন। পুত্র ওয়াশিংটন অমন বিরাট্ শক্তি ইংরাজকে হারিয়ে দিয়ে স্বদেশ আমেরিকার মুক্তিদান করেছেন। তাঁর নাম তখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। বৃদ্ধা মাতার কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। ওয়াশিংটন মাতাকে সংবাদ দিলেন যে তিনি শীঘ্রই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। অমন ছেলের মা যিনি, তোমবা হয়ত ভাব্বে তিনি কতই না ধনসম্পদের অধিকারী, চাকর-চাক্রাণীতে পরিবৃতা। তা কিন্তু মোটেই নয়। তিনি ঐ বৃদ্ধ বয়সেও স্বহস্তেই সব কাজ করতেন। পুত্র তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আস্ছেন, বেশ ত, তাতে তাঁর আর এমন কি করবার আছে। পুত্র তো মায়ের সঙ্গে দেখা করেই থাকে।

জর্জ্জ ওয়াশিংটন যখন সত্যই মাতার সঙ্গে দেখা করতে এলেন তখন তিনি ঘরকন্নায় ব্যস্ত! পুত্রকে ডেকে পাঠালেন। ওয়াশিংটন মার সম্মুখে এলেন। নিজের রক্তমাংস দিয়ে ছেলে গড়া; প্রথমেই মার নজর পড়ল পুত্রের চেহারার দিকে। ওয়াশিংটনের ললাট কুঞ্চিত।

মাতা কুঞ্চিত ললাট দেখে বল্‌লেন, “বিস্তর ঝড়-ঝঞ্ঝা তোমার উপর দিয়ে গিয়েছে ও অনেক পরীক্ষায় তোমাকে উত্তীর্ণ হতে হয়েছে দেখ্‌ছি। তোমাকে দেখে আজ আগেকার কথা—বন্ধু-বান্ধবদের কথা বেশী করে স্মরণ হচ্ছে।” ওয়াশিংটন যে এখন যুদ্ধজয়ী বীর, জয়মাল্য নিয়ে মাতার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, জননী কিন্তু সে সম্বন্ধে একটি কথাও বল্‌লেন না। তোমরা নিশ্চয়ই তাঁব মাতাব কথা ভেবে আশ্চর্য্য হবে। যে-সব বৈদেশিক দূত ওয়াশিংটনের সঙ্গে গিয়েছিলেন তাঁরাও ঠিক এমনি ভাবে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলেন। ওয়াশিংটন-জননী পুত্রেব সাফল্যে যে আনন্দিত হয়েছেন বার থেকে তা কিছুই বুঝা গেল না। তাঁর এই নিস্পৃহ ভাব দেখে বিদেশীরা বলাবলি করতে লাগ্‌ল—এরূপ মাতা ছিলেন বলেই আমেরিকার স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হয়েছে!

আর এক দিনের কথা। তোমরা মার্কুইস লাফায়েতের কথা হয়ত শোন নি। আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামে ফরাসীরা নানাভাবে সাহায্য করেছিল। লাফায়েত নিজেও ফরাসী এবং তাদেরই তরফে বিস্তর স্বেচ্ছা সৈনিক নিয়ে আমেরিকায় যান ও ওয়াশিংটনের

দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ হয়ে যুদ্ধ করেন। আমেরিকার যুদ্ধজয়ের পব লাফায়েতও দেশে ফিরবার পূর্ব্বে ওয়াশিংটন-জননীর সঙ্গে ফ্রেডারিক্সবার্গে দেখা করতে যান। জননী গৃহকর্ম্মে যেমন প্রত্যহ রত থাকেন ওদিনও তেমনিই রত রয়েছেন। যখন সংবাদ এল বিখ্যাত ফরাসী বীর লাফায়েত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন তখন তিনি তাঁকে ডেকে পাঠালেন। ওয়াশিংটন-জননী তাঁকে দেখেই বল্‌লেন, 'বুড়ো মানুষকে তুমি দেখ্‌তে এসেছ, এস, দরিদ্র গৃহে তোমাকে অভ্যর্থনা করি, পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের লৌকিকতায় আর দরকার নেই।' এমন সরল সাদাসিধে ব্যবহারে লাফায়েত অত্যন্ত চমৎকৃত হলেন। তিনি তাঁকে যথারীতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে চলে গেলেন।

সুখে দুঃখে সমভাবাপন্না, সাংসারিক যশ মান প্রতি-পত্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপহীনা ওয়াশিংটন-জননীর কথা জানবার জন্য সে যুগের দেশ-বিদেশের লোকেরা বিশেষ উদ্‌গ্রীব হয়েছিল। আজকালও তাঁর কথা শুন্‌তে তোমরা নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এমন সরল-হৃদয়া নারীর জীবনের ঘটনাগুলি সব কিছুই জানা যায় নি। হয়ত তেমন চিত্তাকর্ষক বা চাঞ্চল্যকর কিছু না হওয়ায় কেউ লিখে রাখবার আবশ্যকতা বোধ করেন নি।

তথাপি যতটুকু জানা গেছে তাই আজ তোমাদের শোনাব।

ওয়াশিংটনের পিতামাতার পূর্ব্বপুরুষ ইংরেজ। তাঁরা ইংলণ্ডেরই অধিবাসী ছিলেন। আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন সুরু হলে তাঁরাও সেখানে যান। তবে বহু লোক যেমন ধর্ম্মানুশীলনে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সেখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন তাঁরাও সেই কারণে সেখানে গিয়েছিলেন কি-না জানা যায় না। ওয়াশিংটন-জননীর পূর্ব্বপুরুষরা বল নামক ইংলণ্ডের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলেন। তাঁরা ভার্জিনিয়ায় এসে বসবাস আরম্ভ করেন।

আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশ বা উপনিবেশগুলির নাম ইংলণ্ডের কোন কোন জেলা বা শহরের নামানুসারে হয়েছে। ভার্জিয়া প্রদেশটির নামে খানিকটা নূতনত্ব আছে। ভার্জিনিয়া তো ইংলণ্ডের কোন জেলা বা শহরের নাম নয়। এ অঞ্চলে যখন উপনিবেশ স্থাপিত হয় তখন রাণী এলিজাবেথ ইংলণ্ডেশ্বরী। তিনি আজীবন ভার্জিন বা কুমারী ছিলেন। তাঁর আমলেই এই উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয় বলে এব নাম হয়েছে ভার্জিনিয়া!

ওয়াশিংটনের পিতার নাম আগষ্টাইন ওয়াশিংটন ও মাতার নাম মেরী। আগষ্টাইনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী

এই মেরী। ওয়াশিংটনের যখন মাত্র দশ বছর বয়স তখন তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। সুতরাং মাতার উপরই পুত্রকন্যার লালন-পালন ও পরিবার-পরিচালনার ভার পড়ল। পিতা সম্বন্ধে ওয়াশিংটনের বিশেষ কিছুই মনে ছিল না। তিনি বল্‌তেন— পিতার আকৃতি মাত্র তাঁর মনে আছে। তাঁর জীবন বা চরিত্রের উপর পিতার কোন প্রভাব পড়েছে কি-না তাও তিনি জানতেন না। তিনি সর্ব্বদা একথাই বলতেন যে, তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধি, ধন-সম্পদ, মান-মর্য্যাদা সবারই মূল কারণ তাঁর জননী। তবে ওয়াশিংটনের পিতা'ও উন্নত চরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি ছেলেদের মানুষ করে যেতে পারেন নি; তাই মেরী অতি শ্রদ্ধা সহকারেই তাঁর কার্য্য সমাধা করেন।

সৎসাহস ও সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা—বাল্যকালেই ওয়াশিংটনের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। এবিষয়ে কোন কোন কাহিনী তোমরা তোমাদের পাঠ্যপুস্তকে পড়ে থাক্‌বে, তাই এখানে আর বিশেষ করে বল্‌ব না।

মেরী ওয়াশিংটন আদর্শ নারী। পতির মৃত্যুর পর তিনি হলেন গৃহের সর্ব্বময় কর্ত্রী। সন্তানদের খেলা-ধূলা, পঠন-পাঠন, আহার-নিদ্রা, দৈনন্দিন সব কার্য্যেই বেশ একটা নিয়ম ও শৃঙ্খলা স্থাপন করলেন। তিনি ছিলেন

ধীর, স্থির ও বুদ্ধিমতী। পুত্রকন্যার আব্দার তাঁকে সবই সহ্য করতে হত। কিন্তু তিনি এমন ভাবে সকল কার্য্য পরিচালনা করতেন যে, আব্দার প্রত্যেকের ন্যায্য প্রাপ্তি ছাপিয়ে উঠ্তে পারত না। আমোদ-প্রমোদ যে জীবনের রসদ। তাই ওয়াশিংটন-গৃহে আমোদ-প্রমোদেরও অভাব ছিল না, কিন্তু তা শুচিতা দ্বারা নিয়মিত হত ও ভদ্রজনোচিত ছিল। বাধ্যতা তাঁর গৃহের প্রধান নিয়ম। তিনি বেশ বুঝেছিলেন—সন্তান অল্প বয়সে অবাধ্য হলে যত অনর্থের কারণ হয়। তাই এদিকে ছিল তাঁর কঠোর দৃষ্টি। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম উদ্ধারকর্ত্তা ও ভাবী সভাপতি জর্জ্জ ওয়াশিংটন শৈশবে মাতার সম্পূর্ণ অনুগত ও বশীভূত ছিলেন। তিনি যে পরবর্ত্তী জীবনে রাষ্ট্রে অমন কর্ত্তৃত্ব করতে পেরেছিলেন তাঁর মূল খুঁজতে গেলে মাতার প্রতি ঐকান্তিক আনুগত্যের মধ্যেই তা পাওয়া যায়। মাতার কর্ত্তৃত্ব সন্তানের উপর কিন্তু বরাবর অক্ষুণ্ণই ছিল।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে তোমাদের বলেছি, আমেরিকায় তখন উচ্চ শিক্ষার তেমন রেওয়াজ হয় নি। সহরের ধনী সন্তান ব্যতীত পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের উচ্চ শিক্ষার সুবিধা ছিল না। ওয়াশিংটন এক

মধ্যবিত্ত পরিবারেব সন্তান। তাঁর শিক্ষারও তখন বিশেষ সুবিধা সুযোগ ঘটে ওঠে নি। কৈশোরে পদার্পণ করেই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা লরেন্সের পরামর্শে তিনি নাবিকের কাজ শিখবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ছেলেকে সমুদ্রে পাঠাতে যে মাতার ভীষণ আপত্তি! অনেক অনুনয়-বিনয়েও যখন মাকে সম্মত করাতে পারলেন না তখন তাঁকে ও-কাজে যাওয়া হতে নিরস্তই হতে হ'ল। তাঁর সৈনিক বৃত্তি গ্রহণেও মাতাব তেমন সম্মতি ছিল না। তবে এ কাজে পুত্রের অত্যধিক আগ্রহ দেখে তিনি তাতে বাধা দেন নি।

আমেরিকাব উপনিবেশগুলি তখন ইংরেজের অধীন ; কাজেই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করে ওয়াশিংটন ইংরেজ সরকারের অধীনেই সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করলেন। আমেরিকাব ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধে তিনি ইংরেজদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। এই যুদ্ধের মধ্যে কয়েকবার শত্রুকে হারিয়ে দিয়ে বিশেষ কৃতিত্বও প্রদর্শন করেন। ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধের অবসান হলে তিনি নিজ গ্রামে ফিরে যান এবং কৃষিকর্ম্মে মন দেন।

এর পরে ইংরেজ ও আমেরিকাবাসীদের মধ্যে বিবাদ বেশ ঘোরাল হয়ে উঠে। এই বিবাদ ক্রমে কিরূপে যুদ্ধে

পরিণত হয় পূর্ব্বে তোমাদের তা বলেছি। ওয়াশিংটন সমগ্র আমেরিকাবাহিনীর অধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত হলেন। মাতৃভক্ত পুত্র এ সময়ে কি মাতার আশীর্ব্বাদ না নিয়ে যেতে পারেন? তাই তিনি এ পদ প্রাপ্তির পরই মাতার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। পুত্রের সৈনিক বৃত্তি গ্রহণে যাঁর তেমন মত ছিল না সেই ওয়াশিংটন-জননী এখন পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করলেন—'স্বদেশের এই মুক্তি-সংগ্রামে তুমি জয়যুক্ত হয়ে ফিরে এস। তিনি ছিলেন ঠিক স্পার্টান জননীর মত। স্পার্টা গ্রীসের একটি প্রদেশ। অতীত যুগে এথেন্সের মতই শৌর্য্যে বীর্য্যে এ রাজ্যটি শীর্ষস্থান অধিকার করে। এখানকার জননীরা পুত্রের যুদ্ধযাত্রা-কালে এই বলে আশীর্ব্বাদ করতেন –'অসি হস্তে গৃহে ফিরে আস্‌বে; তা না হ'লে অসির উপরে চ'ড়ে ফিরবে।' এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, যুদ্ধে পুত্রদের জয়লাভই বাঞ্ছনীয়; তা যদি একান্তই না হয় তা হলে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ফিরে না এসে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে করতে যেন তারা প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়! ওয়াশিংটন-জননীরও আশীর্ব্বাদ ছিল ঠিক এই স্পার্টান জননীর মত। মাতার আশীর্ব্বাদে তিনি যে বল পেয়েছিলেন তাতেই তিনি শেষ পর্য্যন্ত সব বিপদ আপদ উৎরে উঠেছিলেন।

ওয়াশিংটন জননী নির্বিকার চিত্তে গৃহকর্ম্ম যথারীতি করে যেতে লাগলেন। তোমাদের আগেই বলেছি, মেরী সব কাজ নিজ হাতে করতেন, ঝি চাকরাণীর বাহুল্য তাঁর ছিল না। স্বল্প ব্যয়ে সংসার চালিয়ে যা কিছু বাঁচাতেন, আর স্বহস্তে প্রস্তুত জিনিষপত্র বিক্রয় করে যা কিছু পেতেন সবই দীন দুঃখীদের দিয়ে দিতেন।

পুত্র নিজ কৃতি গুণে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট বা সভাপতি হয়েছেন; কিন্তু এ ব্যাপার মেরীর ব্যবহারে বা জীবন-যাত্রা প্রণালীতে কোনই পরিবর্ত্তন আনতে পারে নি। তিনি আগেকার মতই গৃহকর্ম্মরতা সাধারণ নারীই রয়ে গেলেন। ওয়াশিংটন তাঁর নিকট মধ্যে মধ্যে যেতেন। দেশ-বিদেশ থেকে কত খ্যাত-অখ্যাত নরনারী ওয়াশিংটন-জননীকে দেখবার জন্য সেই পল্লী-ভবনে গমন করতেন। মেরী কিন্তু বরাবর একই ভাবে চলতেন। তাঁর ব্যবহারে কখনও কোন তারতম্য লক্ষিত হত না। তাই ফরাসী বীর লাফায়েত অত সহজে আলাপাদি করতে পেরেছিলেন। তিনি লাফায়েতকে পুত্র সম্বন্ধে কথায় কথায় বলেছিলেন, "জর্জ্জি বড় ভাল ছেলে, সে যে এরূপ কাজ করবে তা আশ্চর্য্য নয়!"

মেরী দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। বিরাশী বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। পুত্র ওয়াশিংটনের মৃত্যু হয় তাঁর পূর্ব্বে। বৃদ্ধ বয়সে সহজাত ধৈর্য্যের সঙ্গে পুত্রশোক সহ্য করলেও শরীর তাঁর এর পরই ভেঙ্গে যায় ও তিনি শেষ দিনের অপেক্ষা করতে থাকেন। ফ্রেডারিক্সবার্গে তাঁর সমাধি হয়েছিল। ভার্জিনিয়াবাসীরা ওয়াশিংটন-জননীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য বিশেষ যত্নে তাঁর সমাধির উপর একটি স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণ করে। যুক্তরাষ্ট্র-সভাপতি জ্যাক্সন ইংরেজী ১৮৩৩ সালে মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন করেন।

মেরী ওয়াশিংটন দীর্ঘ ছেচল্লিশ বছর বৈধব্য জীবন যাপন করেছিলেন। তাঁর মানসিক ও শারীরিক বল ছিল অসাধারণ। এই শক্তিই শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে পুত্রশোকের মধ্যেও মানুষের মত বাঁচিয়ে রেখেছিল। পুত্রের যশো-গৌরবে তিনি নিশ্চয়ই অন্তরে অপরিসীম আনন্দ অনুভব করতেন, কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ হতে কেউ কখন দেখে নি। তিনি ছিলেন স্থিতপ্রজ্ঞা নারী।

আদর্শ জননী

আয়েলা-চাপেলিতে ইংরেজী ১৮১৮ সালের অক্টোবর মাসে ইউরোপের রাজন্যবর্গ সমবেত হয়েছেন। গত বিশ বছর কাল যে ব্যক্তি তাঁদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন আজ তিনি সুদূরে নির্ব্বাসিত। তাঁর কাছ থেকে তাঁদের আর কোন ভয়ের কারণ নেই। বিধ্বস্ত দেশগুলির পুনর্গঠন সম্পর্কে উপায় নির্ণয়ের জন্যই এ সম্মেলন আহূত হয়েছে।

তখন কেউ ভাব্‌তেও পারেন নি যে, তাঁদের নিকট একজন মহিলা একখানা পত্র লিখে পাঠাবেন! সেই পত্রে কি লেখা ছিল জান? রাজন্যদের সম্বোধন করে তিনি লিখেছিলেন,—

"মহাশয়গণ, আমি জননী; আমার পুত্রের জীবন আমার জীবনের চেয়েও প্রিয়। যিনি সর্ব্বমঙ্গলের আধার এবং যাঁর ইহজগতের প্রতিরূপ হলেন আপনারা, সেই জগদীশ্বরের নামে আমি আপনাদের নিকট আমার এই বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি যে, আপনারা আমার পুত্রের দুর্দ্দশা সংক্ষেপ করুন এবং তাকে মুক্তি

দিন্। রাষ্ট্রের দাবির একটা সীমা আছে ; ভাবী বংশধরগণ—যাঁদের নিকট আপনারা অমরত্বের দাবি রাখেন, আপনাদের মহানুভবতারই তাঁরা প্রশংসা করবেন।”

এই মর্ম্মস্পর্শী পত্রখানি নেপোলিয়নের জননী মাদাম লেটিসিয়া বিজেতাদের লিখেছিলেন। রাজন্যবর্গ নেপোলিয়নকে কিন্তু ক্ষমা করতে পারেন নি, সেণ্ট হেলেনায় নির্ব্বাসনেই তাঁকে দেহপাত করতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে নির্ব্বাসন-মুক্ত করার জন্য মাদাম লেটিসিয়া যে রকম চেষ্টা করেছিলেন সকলেই তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকেন। লেটিসিয়া দীর্ঘ আশী বছর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। নেপোলিয়ন তার পূর্ব্বেই গত হন। লেটিসিয়ার জীবনে চরম সুখ এবং চরম দুঃখ উভয়ই লাভ হয়েছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন তেজস্বিনী নারী ; চরম সুখেও যেমন তিনি আত্মহারা হয়ে যাননি, চবম দুঃখেও তিনি তেমনি অবিচলিত ছিলেন।

মাদাম লেটিসিয়ার জীবন বৈচিত্র্যময় হলেও খুব কমই এখন আমরা তাঁর সম্বন্ধে জানতে পারি। পিতৃকুল ও শ্বশুর কুল উভয়েরই নিবাস ছিল কর্সিকা দ্বীপে। এখানকার আজাসিও শহরে ১৭৫০ সালে ২৪এ আগষ্ট তারিখে লেটিসিয়া জন্মগ্রহণ করেন। চার্লস বোনাপার্টির সঙ্গে যখন

বিবাহ হ'ল তখন তাঁর বয়স ষোলও হয়নি। কর্সিকা দ্বীপে শত্রুর আক্রমণ লেগেই থাকত। কত বার যে আত্মরক্ষার জন্য নিকটবর্ত্তী পাহাড়-পর্ব্বতে তাঁদের আশ্রয় নিতে হয়েছিল তার কি ঠিক-ঠিকানা আছে? শত্রু চলে গেলে যখন মনে হত সব নিরাপদ তখন তাঁরা নিজগ্রামে ফিরে আসতেন। শৈশব থেকেই এইরূপ বিপদের মধ্যে লেটিসিয়া মানুষ হয়েছিলেন, কাজেই তিনি যে সাহসী, শক্তিমতী ও তেজস্বিনী হবেন তাতে আর আশ্চর্য্য কি? নেপোলিয়নেব জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাঁদের একবার ঐরূপ বিপদে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু শরীরের ও অবস্থায়ও লেটিসিয়া সব কষ্ট সহ্য করেন।

লেটিসিয়া ধর্ম্মপরায়ণা নারী, গীর্জ্জার উপাসনায় তাঁর যোগ দেওয়া চাই। একদিন তিনি গীর্জ্জায় উপাসনা করতে গেলেন। তিনি বুঝতে পারেন নি যে, তিনি আসন্নপ্রসবা। গীর্জ্জা হ'তে গৃহে পৌঁছতেই, একখানা শতচ্ছিন্ন কম্বলের উপর ভাবী বীর নেপোলিয়ন প্রসূত হলেন!

মাদাম লেটিসিয়া ও চার্ল্‌স্ বোনাপার্টির তেরটি সন্তান হয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পাঁচ পুত্র আর তিন

কন্যা মাত্র জীবিত ছিলেন। ওয়াশিংটন-জননীর মত মাদাম লেটিসিয়াও ছিলেন গৃহের সর্ব্বময় কর্ত্রী। শৈশবে সন্তানদের লালন-পালন ও শিক্ষার ভার ছিল তাঁর উপর। তাঁর সম্বন্ধে নেপোলিয়ন কি বলেছেন শোন,—

"মা ছিলেন একাধারে কোমল ও কঠোর। সকল সন্তানই তাঁর চক্ষে সমান; দণ্ড বা পুরস্কার দানে তিনি ছেলেমেয়েদের মধ্যে কখন কোনরূপ তারতম্য করতেন না। ভাল্ মন্দ মাঝারি কেউই আমরা তাঁর কাছে রেহাই পাই নি। আমাদের উপর মার ছিল কড়া নজর। নীচতাকে তিনি বড়ই অবজ্ঞা করতেন। তাঁর মন ছিল উদার, চরিত্র ছিল উন্নত। তিনি মিথ্যাকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন, অবাধ্যতা দেখলে চটে যেতেন। আমাদের দোষ ত্রুটি তাঁর চোখ এড়াত না।"

এই রকম মার সন্তান ছিলেন নেপোলিয়ন। চার্লস বোনাপার্টি যখন গতায়ু হলেন তখন মাদাম লেটিসিয়ার বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর। স্বামীর মৃত্যুর পর সংসারের দেখা শুনা করতেন নেপোলিয়নের কাকা। কিন্তু তিনিও অল্পদিন পরে মারা যান। নেপোলিয়নের এই কাকার খুব অন্তর্দৃষ্টি ছিল। শৈশবেই এই ভ্রাতুষ্পুত্রটির গুণপনা দেখে তিনি জ্যেষ্ঠ জোসেফকে একদিন বলেছিলেন,

"জোসেফ, তুমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বটে, কিন্তু নেপোলিয়ন হবে পরিবারের কর্ত্তা !" তাঁর কথা একদিন ফলেছিল।

স্বামীর মৃত্যুর পর যখন দেবরও মারা গেলেন তখন সংসারের সব ভারই পড়ল একা মাদাম লেটিসিয়ার উপর। অতগুলি সন্তান-সন্ততি নিয়ে তাঁকে অতিকষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করতে হত। ছেলেমেয়েদের মানুষ করার কঠিন কাজও তাঁর উপরে পড়ল।

কর্সিকার উপরে ঝড়-ঝঞ্ঝার বিরাম ছিল না। ইংরেজী ১৭৯৩ সাল। শাসন-কর্ত্তা পাওলি ইংরেজদের হাতে কর্সিকা ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হলেন। তখন ফরাসী পক্ষীয়েরা প্রমাদ গণলে। পাহাড় থেকে হাজার হাজার লোক নেমে এসে আজাসিওতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'ল। কত গৃহ লুণ্ঠিত হ'ল। বোনাপার্টিদের গৃহও বাদ গেল না। এ পরিবারের সঙ্গে তখন ফরাসীদের যোগসূত্র বিশেষ ভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। নেপোলিয়ন এতদিন ফ্রান্সে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষায় রত ছিলেন। ও সময় তিনি ছুটিতে বাড়ী এসেছিলেন, তখনই এই দুর্য্যোগ উপস্থিত হয়। ফরাসীদের সঙ্গে তাঁদের যোগ রয়েছে—একারণ নেপোলিয়ন, জোসেফ ও লুসিয়েনের উপর অবিলম্বে কর্সিকা ত্যাগের আদেশ হ'ল। লেটিসিয়াও শিশুসন্তানদের নিয়ে ফ্রান্সে রওনা

হলেন। একজন নয়, তু'জন নয় ; এতগুলি সন্তান-সন্ততি নিয়ে বিদেশ বিভূঁয়ে কেমন করে চালাবেন এসব ভাব্‌বারও তখন তাঁর অবসর ছিল না। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে প্রথমে ফ্রান্সের নাইস সহরে উপনীত হলেন। সেখান থেকে তাঁরা মার্সাইয়ে যান এবং এই শহরেই বসবাস আরম্ভ করেন।

এখানে লেটিসিয়াকে পুত্রকন্যাসহ দীর্ঘ ছ' বছর কাটাতে হয়েছিল। ফ্রান্সে তখন ঘোর বিপ্লব। ফরাসী জাতি ফ্রান্সের শাসন-যন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠেছে। রাজা-রাণী আব তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত শাসন-পদ্ধতি বিপ্লবের তুর্বার গতির সম্মুখে কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আজ এ দল, কাল সে দল—এই রকম করে বহু দল একে একে শাসনদণ্ড গ্রহণ করলে, আর একের পর এক উপযুক্ত মূল্য দিয়ে শাসন-রঙ্গমঞ্চ হতে চলে গেল। ফ্রান্সে এই ছিল সত্যিকারের বিপ্লব। এর মধ্যে উপায়হীন সম্বলহীন সাধারণ লোকের কষ্টতুঃখের অবধি ছিল না। পুরুষের পক্ষেই অন্ন-সংগ্রহ করা সুকঠিন, নারী কেমন করে তাঁর ছেলেমেয়ের মুখে তু'মুঠা অন্ন দিবেন? মাতা লেটিসিয়া ভীষণ বিপদে পড়লেন। এমন কত দিন গিয়েছে যখন শিশু সন্তানদের নিয়ে তাঁকে অনশনে, অর্দ্ধাশনে কাটাতে হয়েছে। নেপোলিয়ন মাতার এই তুঃখের কথা কখনও ভুলেন নি।

কত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও জননী এই পরিবারটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন—একথা উল্লেখ করতে তিনি গৌরবই অনুভব করতেন। নেপোলিয়ন তাঁর মাতার এ সময়কার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বলেছেন—"মার কোন চালক বা রক্ষক ছিল না। এই দুর্য্যোগের মধ্যে তিনি নিজেই সংসারের ভার বহন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই গুরু ভার বহন করা তাঁর পক্ষে মোটেই সাধ্যাতীত ছিল না। তিনি এমন বিচক্ষণতার সঙ্গে সব চালিয়ে নিয়েছিলেন যে, তাঁর বয়সী অন্য কোন মহিলার কাছ থেকে তা আশাই করা যায় না।"

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের মোড় ফিরল। সৈনিক নেপোলিয়ন তখন ফরাসী রিপাব্লিকের সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়ে বস্লেন। মাদাম লেটিসিয়ারও দুঃখ দৈন্য ঘুচ্ল। নেপোলিয়ন ফ্রান্সের শাসন-কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করে দারিদ্র্য-প্রপীড়িত মাতাকে রাজধানী প্যারিসে নিয়ে গেলেন। এখানে এসে লেটিসিয়া প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারিণী হলেন ও নিরিবিলি জীবন যাপন করতে লাগলেন।

এই রকম করে দেখ্তে দেখ্তে পাঁচটি বছর কেটে গেল। ফরাসী বিপ্লব ও রিপাব্লিকের তখন অনেক

পরিবর্ত্তন ঘটেছে। নেপোলিয়ন ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে নিজেকে ফ্রান্সের সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন! তখন সম্রাট-মাতা লেটিসিয়ার দিকে সকলের নজর পড়ল। চিরাচরিত রীতি অনুসারে লেটিসিয়া 'মাদাম মেরী' উপাধিতে ভূষিত হলেন। ফ্রান্সের আর একটি নিয়ম অনুসারে রাজমাতা লেটিসিয়া ফ্রান্সের জাতীয় দাতব্য অনুষ্ঠানগুলির অধিনেত্রী স্বরূপ 'প্রোটেক্‌ট্রিস্‌ জেনারেল' পদ লাভ করলেন।

মাদাম লেটিসিয়া এখন রাজমাতা, বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল ভীষণ কষ্টে কাটিয়েছেন, অনশনের জ্বালাও তিনি সহ্য করেছেন। এরকম অবস্থায় হঠাৎ বিস্তর ধনরত্নের মালিক হলে লোকে অনেকটা বেতালা হ'য়ে উঠে, বিলাসিতাও অনেকটা বেড়ে যাওয়া সম্ভব। লেটিসিয়া সে ধরণের রমণী ছিলেন না। দুঃখের দিনের কথা এ সম্পদের মধ্যেও তিনি ভুলতে পারেন নি। তাই অন্য দশ জনের মত বেহিসাবী হয়ে যাননি। তিনি পরিমিত ভাবে ব্যয় করে চল্‌তেন। কিন্তু এ কথাও ভুললে চল্‌বে না যে, তিনি তখন রাজমাতা। সাধারণে তাঁর নিকট অনেক কিছু আশা করত। দান ধ্যানে তাঁর মুক্ত হস্ত হওয়াই তাদের কাম্য। কিন্তু লেটিসিয়ার সঞ্চয়শীলতা কার্পণ্যেরই কাছাকাছি গিয়ে পড়েছিল।

তাই সাধারণে এর প্রশংসাবাদ না করে, আশেপাশে কাণাঘুষা করত ; এমন কি নিন্দা করতেও ছাড়ত না। অত ঐশ্বর্য্যের মালিক হয়ে, সঞ্চয়ের দিকে তাঁর এত ঝোঁক কেন ?—একথা জিজ্ঞাসা করলে লেটিসিয়া উত্তর দিতেন, "দুঃখের দিন যে ফিরে আস্‌বে না তা কে বল্‌তে পারে ? আজ যাদের রাজসিংহাসনে দেখছ, একদিন হয়ত তাদের জন্য আমাকেই রুটি সংগ্রহ করতে হবে।" মাদাম লেটিসিয়ার দূর দৃষ্টি ছিল অসাধারণ।

নেপোলিয়ন ফ্রান্সের কর্ত্তৃত্ব পেয়ে ইউরোপ মহাদেশের সর্ব্বত্র ক্ষমতা বিস্তারে প্রয়াসী হলেন। পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণের কত দেশ একে একে তাঁর করতলগত হ'ল। তার বিজয়ের পথে যারা বাদ সাধতেন তিনি নির্ম্মম ভাবে তাদের দমন করতেন। নেপোলিয়ন ধর্ম্মে রোমান ক্যাথিলিক হলেও, কি প্রোটেষ্ট্যাণ্ট কি রোমান ক্যাথিলিক বিঘ্নকারী মাত্রেরই প্রতি ছিল তাঁর সমান নির্ম্মমতা। মাদাম লেটিসিয়া খুবই তেজস্বিনী ও শক্তিধর মহিলা, তথাপি তিনি নারী ; অন্যায় অধর্ম্মের প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক বিরক্তি ছিল। তাই নেপোলিয়নের সমক্ষে তাঁর কোন কোন কার্য্যের প্রতিবাদ করতেও তিনি ছাড়েন নি। ধর্ম্মগুরু পোপের প্রতিও নেপোলিয়ন

ভাল ব্যবহার করেন নি। এতে ধর্ম্মপ্রাণা লেটিসিয়া মনে বড়ই আঘাত পান। তিনি তাঁর ভ্রাতা কার্ডিনাল ফেশ্‌কে দুঃখ করে বলেছিলেন,—"তোমার ভাগিনেয় যে উপায় অবলম্বন করেছে তাতে সে নিজেকে বিনষ্ট করবে, আমাদেরও ধ্বংস করবে। সে সবই হারাবে। অনেক কিছুই অধিকার করতে গিয়ে সবটাই হারিয়ে ফেল্‌বে। সমগ্র পরিবারের জন্যই আমার ভয়, তাই বিপদের দিনের জন্য আমি কিঞ্চিৎ জোগাড় করে রাখ্‌ছি।"

নেপোলিয়ন সম্রাট, কিন্তু তাই বলে লেটিসিয়া কখনও তাকে সমীহ করে চলেন নি। একদিন নেপোলিয়ন অনুযোগ করে মাকে বলেন, "মা, লুসিয়নকে তুমি অত্যধিক ভালবাস।" লেটিসিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "আমার যে সন্তান সকলের চেয়ে বেশী দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তাকেই আমি সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসি।" নেপোলিয়ন শেষ জীবনে মার কথার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন।

পুত্রের অত্যধিক রাজ্যস্পৃহায় মাদাম লেটিসিয়ার আশঙ্কা দিন দিনই বেড়ে গিয়েছিল। কিছুকালের মধ্যেই নেপোলিয়নের ভাগ্যবিপর্য্যয় সুরু হ'ল। স্পেনের যুদ্ধ ও মস্কোর অভিযান তাঁর কাল হ'ল। ওয়াটার্লু'র

যুদ্ধে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন হেরে গিয়ে বন্দী হলেন। প্রথমে এল্‌বায় ও পরে সেণ্ট হেলেনায় তাঁকে নির্ব্বাসিত করা হ'ল। মাদাম লেটিসিয়া জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন, কিন্তু নেপোলিয়নের পরাজয় তাঁর বক্ষে যেমন বেজেছিল এমনটি আর কিছুতেই বাজে নি। নির্ব্বাসিত পুত্রের সঙ্গে বাস করবার জন্য কয়েকজন পরিচারিকাসহ তিনিও এল্‌বায় গেলেন।

এল্‌বা থেকে নেপোলিয়ন পালিয়ে যান। তখন মাদাম লেটিসিয়া রোমে গমন করেন এবং সেখানেই অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। দুর্ভাগ্য নেপোলিয়নের প্রতি লেটিসিয়ার সমস্ত স্নেহ যেন উছ্‌লে উঠেছিল। নেপোলিয়ন বলেছেন, "মা তাঁর সমস্ত ধনসম্পত্তি আমাকে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর বক্ষ মধ্যে সেই উন্নত মনোভাব এখনও আগের মতই বিরাজিত। অর্থের লোভ তাঁর সদ্‌বৃত্তিগুলিকে দমন করতে পারে নি।" নেপোলিয়ন ইংরেজের কিছুই সহ্য করতে পারতেন না। ইংরেজ ডাক্তার প্রেরণের প্রস্তাব হলে তিনি তাঁর দ্বারা চিকিৎসিত হতে অস্বীকার করেন। তখন মাদাম লেটিসিয়া নিজ ব্যয়ে সেণ্ট হেলেনায় চিকিৎসক ও প্রেরণ করেন। মাদাম লেটিসিয়া সত্যিকারের আদর্শ জননী।

জাতির বরণীয়

১

এতক্ষণ তোমবা যাঁদের কথা শুনলে, এক জিজাবাঈ ছাড়া তাঁদের আর সকলেই বিদেশী। এখন যাঁদের কথা বলব, তাঁরা আমাদেরই এই বাংলা দেশের মানুষ। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। তাঁর পিতামাতা সম্বন্ধে এখানে কিছু বলব।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বড় জীবনীগ্রন্থ আছে, তাঁর স্বরচিত ছোট একখণ্ড জীবনীও আছে। এসব থেকেই আমরা তাঁর পিতামাতা সম্বন্ধে কিছু কিছু জানতে পারি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্ম বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে, তার পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতার নাম ভগবতী দেবী। ঠাকুরদাসের বাল্যকালেই পিতা রামজয় তর্কভূষণ বিবাগী হয়ে দূর দেশে চলে যান। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশ। তাঁদের সঞ্চয় এমন কিছুই নেই যে; আয় বন্ধ হলে ছ' মাস ছ' মাস সংসার খরচ চলে যেতে পারে। রামজয়

নিরুদ্দেশ হলে দুর্গাদেবী দুই কন্যা আর চার পুত্র নিয়ে মহা ফাঁপরে পড়লেন। বনমালীপুরে শ্বশুর গৃহে দেবরের আশ্রয়ে কিছুকাল থেকে তিনি পুত্র-কন্যাদের নিয়ে পিত্রালয়ে চলে যান। দুর্গাদেবীর পিত্রালয় বীরসিংহ গ্রামে। এই গ্রামেই ঠাকুরদাস পরে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। দুর্গাদেবীর পিতা উমাকান্ত তর্কালঙ্কার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, তদুপরি বৃদ্ধ। উপরি একটি সংসারের ভার তাঁর পক্ষে বহন করা দুরূহ। কিছুকাল কন্যাকে নিজ গৃহে রেখে, তাঁর জন্য ঐ গ্রামেই একটি আলাদা বাড়ী করে দিলেন। দুর্গাদেবী যথাসময়ে এই বাড়ীতে উঠে এলেন।

এখানে দুর্গাদেবীর কষ্টের অবধি ছিল না। চরখা ও টেকোয় সূতা কেটে তিনি কিছু রোজগার করতেন, কিন্তু তাতে কি সাত-আট জনের সংসার চলে ? কতদিন অনশন অর্দ্ধাশনে কাটাতে হয়েছে তাঁদের। ঠাকুরদাস জ্যেষ্ঠপুত্র। তিনি কিছুদিন বনমালীপুরে ও বীরসিংহে সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেছিলেন। মাতা ও ভ্রাতাভগিনীর দৈন্যদশা দূর করবার জন্য এই বিদ্যা মাত্র সম্বল করে পনর বছর বয়সে তিনি অর্থের অন্বেষণে 'কলিকাতা যাত্রা করেন। সেখানে জগন্মোহন তর্কালঙ্কার নামে তাঁর এক

সদাশয় জ্ঞাতিপুত্রের বাসায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। তিনিও ছিলেন পণ্ডিত।

ঠাকুরদাসের অর্থের আশু প্রয়োজন। সে-যুগে কিঞ্চিৎ ইংরেজী জান্‌লেই চাকুরি জুটত। তখন কেউ ইংরেজী ওয়ার্ড-বুক থেকে কয়েকটি শব্দ মুখস্থ করে তালমাফিক প্রয়োগ করতে পারলেই লোকে মনে করত এ খুব ইংরেজী জানে! জগন্মোহনের এক বন্ধু ছিল ইংরেজী জানা। তিনি তাঁকেই ঠিক করে দিলেন ঠাকুরদাসকে ইংরেজী পড়াবার জন্য। বন্ধুটি দিনমানে নানা কাজে ব্যস্ত থাকতেন, যখন বাসায় ফিরতেন তখন রাত হয়ে যেত। ঠাকুরদাস তাঁর বাসায় গিয়ে অধিক রাত্রি জেগে ইংরেজী শিখতেন।

এইরূপে কিছুকাল কাটে। একদিন বন্ধুটির হঠাৎ ঠাকুরদাসের শরীরের প্রতি নজর পড়লে দেখলেন, সে কেমন শীর্ণ হয়ে গেছে। বন্ধুটির পীড়াপীড়িতে ঠাকুরদাস বল্‌লেন, "জগন্মোহনের বাড়ীতে উপরি লোকের রাত্রের আহার সন্ধ্যার পরেই সেরে নিতে হয়। আমি অনেক রাত পর্য্যন্ত আপনার বাড়ীতে থাকি, কাজেই আমার রাত্রে আর খাওয়া হয় না, আমাকে একাহারেই থাকতে হয়।" ঠাকুরদাস ও ভদ্রলোকটির মধ্যে যখন এই কথা হয়েছিল

তখন সেখানে তৃতীয় একব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তিনি দয়াপরবশ হয়ে নিজ ভবনে ঠাকুরদাসকে আশ্রয় দিলেন। সেখানে তাঁকে নিজ হস্তে রান্না করে খেতে হত।

কিন্তু এখানেও ঠাকুরদাস বেশী দিন শান্তিতে কাটাতে পারলেন না। তাঁর আশ্রয়দাতা দালালি কাজ করতেন। ব্যবসা মন্দা হওয়ায় তাঁর অবস্থা হঠাৎ খারাপ হ'ল। তিনি সকালেই বাড়ীর বাইরে যেতেন, দিনান্তে কিছু সম্বল করে ফি'রে এলে তবে ঠাকুরদাসের রান্না হ'ত ও দু'জনে ভাগ করে খেতেন। ঠাকুরদাসকে কতদিন ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করতে হয়েছে!

একে তো নিজের এইরূপ কষ্ট, তার উপর মাতা ও ভ্রাতা-ভগিনীর কথা যখন তাঁর মনে হ'ত তখন আর ঠাকুর-দাস স্থির থাকতে পারতেন না। তাঁর ইংরেজী পড়া আর হ'ল না। আশ্রয়-দাতাকে তিনি একদিন সানুনয়ে বললেন একটি চাকুরি করে দেবার জন্য। তাঁরই চেষ্টায় ঠাকুরদাসের একটি কর্ম্ম জুটল, বেতন মাসিক দু-টাকা। পুত্রের কর্ম্মের সংবাদ যখন দুর্গাদেবীর কর্ণে পৌঁছল তখন বাড়ীতে আনন্দের রোল উঠল। ঠাকুরদাস আশ্রয়-দাতার আশ্রয়ে অতি কষ্টে কাটিয়ে এই দুটি টাকা প্রতি মাসে মায়ের নিকট পাঠিয়ে দিতেন।

ইতিমধ্যে পিতা রামজয় তর্কভূষণ দেশে ফিরে এলেন। নিরুদ্দেশ কালে রামজয় একাকী দূর দূরান্তের তীর্থ-সমূহ ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন খুবই শক্তিধর পুরুষ। শুধু-হাতে বাঘ ভালুকের সঙ্গে তিনি লড়াই করতেন। তিনি আত্মীয়-স্বজন কারো তোয়াক্কা রেখে চলতেন না, বেপরোয়া পুরুষ ছিলেন। স্পষ্টবাদিতার জন্য শ্বশুরের গ্রাম বীরসিংহে তাঁকে অনেকবার বিপদে পড়তে হয়েছিল, কিন্তু কিছুতেই তাঁকে দমাতে পারত না। পিতামহের এই তেজস্বিতা ঈশ্বরচন্দ্র উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন।

কয়েকদিন বীরসিংহে থেকে রামজয় পুত্র ঠাকুরদাসের অন্বেষণে কলিকাতায় যান। আশ্রয়-দাতার মুখে পুত্রের কষ্টসহিষ্ণুতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার অশেষ প্রশংসা শুনে রামজয় মুগ্ধ হলেন। বড়বাজার-নিবাসী উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ ভগবতীচরণ সিংহ নামে তাঁর এক বন্ধু ছিলেন। রামজয় পুত্রের কষ্টের কথা তাঁর নিকট বল্লেন। সিংহ মহাশয়ের আগ্রহে তিনি ঠাকুরদাসকে সেখানে রেখে এলেন।

এর মধ্যে ঠাকুরদাসের বেতন দু' টাকা হ'তে পাঁচ টাকায় বর্দ্ধিত হয়। তিনি এই পাঁচটি টাকাই মাতার নিকট পাঠাতেন। সিংহ মহাশয়ের ভবনে ঠাকুরদাস

যেন নবজীবন লাভ করলেন। এখানে আসার পর হ'তে তাঁর অন্নকষ্ট ঘুচল, দু'বেলা পেট পুরে খেতে পেলেন। ভগবতীচরণ ঠাকুরদাসকে মাসিক আট টাকা বেতনের একটি কর্ম্ম ঠিক করে দিলেন। পুত্রের বেতন বৃদ্ধির সংবাদে দুর্গাদেবী কতই না উল্লসিত হ'লেন!

ঠাকুরদাস চব্বিশ বৎসরে পদার্পণ করলেন। রামজয় পুত্রের বিবাহের জন্য উদ্যোগী হলেন। গোঘাটনিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের কন্যা ভগবতী দেবীর সঙ্গে ঠাকুরদাসের বিবাহ হ'ল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতৃ-ভক্তির অনেক কাহিনী তোমরা হয়ত ইতিমধ্যেই শুনেছ। ঈশ্বরচন্দ্র আত্মচরিতে মাতা ভগবতী দেবী সম্বন্ধে বল্‌তে গিয়ে তাঁর পিতৃকুল ও মাতৃকুল সম্বন্ধেও কিছু কিছু লিখে গেছেন। ভগবতী দেবীর পিতা রমাকান্ত তর্কবাগীশ তন্ত্র চর্চ্চা করে উন্মাদগ্রস্ত হন। মাতা গঙ্গাদেবী দুই কন্যাসহ পিত্রালয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ভগবতী দেবীর জ্যেষ্ঠ মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণ আদর্শচরিত্রের লোক ছিলেন। দীনদুঃখীর প্রতি তাঁর দয়া ছিল অসাধারণ। অন্নহীনদের জন্য তাঁর গৃহ উন্মুক্ত ছিল। ভগবতী দেবীর শৈশব শিক্ষা হয় এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট। দুঃখীর দুঃখ বিমোচন ভগবতী দেবীও যে জীবনের ব্রত করে

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ভগবতী দেবী

৬৪ পৃষ্ঠা

নিয়েছিলেন তার গোড়াপত্তন হয় এখানে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও একথা বিশেষভাবে বলে গেছেন।

ক্রমে ঠাকুরদাসের বেতন হ'ল মাসে দশ টাকা। তিনি কৈশোরে লেখাপড়া শিখতে পারেন নি। তবে বিদ্যাচর্চ্চার দিকে তাঁর অনুরাগ ছিল অসামান্য। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁর সঙ্কল্প যে করেই হোক্ পুত্রকে মানুষ করতে হবে--পণ্ডিতকুলে তাঁর জন্ম। নিজে অবস্থাবৈগুণ্যে দেবভাষা সংস্কৃতের চর্চ্চা করতে পারেন নি। পুত্রকে এই শিক্ষাই দিতে হবে—এ কথা তাঁর মনে বরাবর জাগরুক ছিল। শৈশবেই পুত্রকে গ্রামের পাঠশালা ছাড়িয়ে তিনি নিজেব কাছে কলিকাতায় তাঁকে নিয়ে এলেন। কিন্তু এখানে এসে ঈশ্বরচন্দ্র অসুখে পড়লেন। আবার তাঁকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হ'ল। কিন্তু ঠাকুরদাসের প্রতিজ্ঞা অটল। পুত্র নিরাময় হলে তিনি পুনরায় তাঁকে কলিকাতায় নিয়ে চল্‌লেন। তখন ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স সবে মাত্র ন' বছর। রাস্তায় মাইলষ্টোন্ দেখে ঈশ্বরচন্দ্র এবার এক থেকে নয় পর্য্যন্ত ইংরেজী সংখ্যা শিখে ফেলেছিলেন! ঠাকুরদাস পুত্রের এইরূপ মেধাশক্তি দেখে আত্মীয়-স্বজনের নিকট গল্প করতে ছাড়েননি। আত্মীয়-স্বজনরা ঈশ্বরকে ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়ে দিতে পরামর্শ দিলেন।

কিন্তু ঠাকুরদাস আগেই যে সঙ্কল্প করে রেখেছেন, পুত্রকে সংস্কৃত পড়াবেন। তিনি ঈশ্বরকে সংস্কৃত কলেজেই ভর্ত্তি করে দিলেন।

ঠাকুরদাস এসময় লোহার দোকানে বিল-সরকারের কাজ করতেন। বেলা এক প্রহরের সময় তিনি কর্ম্মস্থলে যেতেন আর বাড়ী ফিরতেন এক প্রহর রাত্রিতে। ঈশ্বরচন্দ্রের দেখাশুনার ভার ছিল ঐ সিংহ-পরিবারের উপর। ঈশ্বরচন্দ্র বলে গেছেন, সিংহ-পরিবারের মেয়েরা, বিশেষ করে ভগবতীচরণের বিধবা কন্যা দয়াময়ী যদি পুত্রবৎ স্নেহে তাঁকে লালনপালন না করতেন তাহলে তাঁর পক্ষে মানুষ হওয়া বড়ই কঠিন হত। ঠাকুরদাস দিনভর খাটুনির পর রাত্রে বাসায় ফিরে পুত্রের লেখাপড়ার তদারক করতেন। ঈশ্বরচন্দ্রও কলেজের পড়া করে রাত্রে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, কখন কখন ঘুমিয়েও পড়তেন। কিন্তু ঘুমিয়ে থাকা সম্ভব ছিল না, পিতার কড়া শাসনে তৎক্ষণাৎ তাঁকে উঠে পড়তে হ'ত। ঠাকুরদাসের নিকট দিনের পড়া পুত্রকে সবটাই আবৃত্তি করতে হত। আবৃত্তিতে কিছুমাত্র ত্রুটি হলে তিনি তাঁকে দণ্ড দিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বলেন, তাঁর আবৃত্তি শুনে শুনে ঠাকুরদাসও সংস্কৃত শিখে নিয়েছিলেন।

ঠাকুরদাসের শিক্ষায় ফলও হ'ল খুব ভাল। ঈশ্বরচন্দ্র কলেজের প্রতি পরীক্ষায়ই প্রথম হয়ে যথারীতি বৃত্তি ও পারিতোষিক পেতে লাগলেন। এতেই ঈশ্বরচন্দ্রের পড়ার ব্যয় এক রকম চলে যেত; কাজেই ঠাকুরদাসের পক্ষে নিশ্চিন্ত মনে পরিবার প্রতিপালন সম্ভব হ'ল। ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করে বিদ্যাসাগর উপাধি পেলেন ও সরকারে চাকরি নিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরবর্ত্তী জীবন নিজ মহিমায় উজ্জ্বল। ঠাকুরদাস এমন পুত্রের পিতা হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রও পিতার অপরিসীম কষ্টসহিষ্ণুতা, অটল প্রতিজ্ঞা, অপূর্ব্ব ত্যাগ স্বীকারের কথা কখনও ভুলতে পারেন নি! পিতামাতাকে তিনি দেবতা জ্ঞানে পূজা করতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের মাতা ভগবতী দেবী ছিলেন দয়ার প্রতিমূর্ত্তি। পুত্রের সুসার হলে অভাবও ঘুচল। তখন থেকে তাঁর সহজাত দয়া প্রকাশ আরও বেড়েই গেল। অভুক্ত লোক তাঁর গৃহ থেকে ফিরে যেতে পারত না। দুঃস্থকে নিজস্ব যা-কিছু সব দিয়েও যেন তাঁর তৃপ্তি হ'ত না। বালবিধবার দুঃখে তাঁর প্রাণ কাঁদত। তাঁর মুখেই বালবিধবার দুঃখের কথা শুনে পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিধবা-বিবাহ

প্রচলনে অতখানি উদ্বুদ্ধ হন। শেষজীবনে ঠাকুরদাস ও ভগবতী দেবী উভয়েই কাশীবাসী হন। উভয়েই সেখানে কাশীলাভ করেন।

২

গত শতাব্দীতে এদেশে আর একজন মহিলা জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁর কথাও তোমাদের বিশেষ করে বলা দরকার। সর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম তোমরা অনেকেই শুনে থাক্‌বে। তিনি ছিলেন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র, কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল ও ন্যায়নিষ্ঠ বিচারপতি, আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় ভাইস্‌চ্যান্সেলর। কিন্তু এসবের উপরেও তিনি ছিলেন একজন আদর্শ মানুষ। কার শিক্ষাগুণে তিনি এতটা উন্নতিলাভ করেছিলেন তা কি তোমরা জান? ইনি সর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জননী সোনামণি দেবী। সোনামণি দেবীর মত নারী শুধু বঙ্গদেশে কেন, যে-কোন দেশেরই গৌরব। নিরালায় বসে নিজের মনের মত করেই নয়ননিধি পুত্রকে তিনি তৈরী করেছিলেন

গুরুদাসের পিতামহ কলিকাতার নারিকেল ডাঙ্গায় বসতি স্থাপন করেন। পিতা রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কার ঠাকুর কোম্পানীর আপিসে পঞ্চাশ টাকা বেতনে চাক্‌রি করতেন। কর্ত্তব্যপরায়ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ বলে তাঁর খুব খ্যাতি ছিল। পূজাহ্নিক সেরে আফিসে যেতে তাঁর কিঞ্চিৎ বিলম্ব হত। মনিবরা একথা জান্‌তেন, কিন্তু তাঁকে কিছুই বলতেন না। তাঁর সহকর্ম্মচারীরা কিন্তু তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিল। কাজের পক্ষে ঐরূপ মনোভাব দূষনীয় ভেবে মনিবরা বুদ্ধি করে হাজিরাবই রাখার ভার দিলেন রামচন্দ্রের উপর। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ রামচন্দ্র এর পর থেকে প্রত্যহ সকলেরই আগে আপিসে উপস্থিত হতেন!

গুরুদাসের বয়স তখনও তিন বছর উত্তীর্ণ হয়নি; এই সময় পিতা রামচন্দ্র ইহধাম ত্যাগ করলেন। মাতা সোনামণি দেবীর উপরই পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়ল। গুরুদাস জননীর একমাত্র সন্তান। জননীর সমস্ত স্নেহ ভালবাসা এই সন্তানে পুঞ্জীভূত হয়েছিল। তিনি নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে পুত্রকে মানুষ করতে লাগলেন। রামচন্দ্র কিছুই রেখে যাননি। সোণামণির কষ্টের সীমা ছিল না। কিন্তু এই কষ্টের মধ্যেও তাঁর মুখে ক্লান্তির রেখাপাত হয়নি,

অবসাদ কাকে বলে তা তিনি জান্‌তেন না। তাঁর ছিল এমনই শিক্ষা।

সোণামণি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কন্যা। কলিকাতার শোভাবাজার রাজ-পরিবারের বিদ্যোৎসাহিতা শুনে ঐ অঞ্চলে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বসবাস করতে আরম্ভ করেন। পণ্ডিত রামকানাই বাচস্পতিরও শোভাবাজারেই বসতি ছিল। তাঁরই চতুর্থ কন্যা সোণামণি দেবী। আদর্শ হিন্দু গৃহস্থের যাবতীয় কর্ম্মই বাচস্পতি-গৃহে প্রতিপালিত হ'ত। বার মাসে তের পার্ব্বণ লেগেই ছিল। শৈশব হতেই সোণামণির জীবন হিন্দু রীতিনীতি দৃষ্টে গড়ে উঠেছিল। পিতার নিকট থেকে আর একটি শিক্ষা তাঁর হয়েছিল—লোভ-শূন্যতা। এই নির্লোভ বা লোভ-শূন্যতা এ যুগে বিরল ; কিন্তু সে যুগে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা এই গুণটির জন্য সমাজে শীর্ষস্থানীয় হয়ে উঠেছিলেন।

সোণামণি দেবীর অবস্থা এমন সচ্ছল নয় যে, বেতন ও পুস্তক জুগিয়ে ছেলেকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দেন। এজন্য তিনি প্রথমে তাঁর ভ্রাতার শরণাপন্ন হলেন। কিন্তু পুত্রকে বেশী দিন অন্যত্র রাখায় তিনি মনে সোয়াস্তি পেলেন না। নিজের কাছে ফিরিয়ে এনে তাঁকে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে

ভর্ত্তি করে দিলেন। এই স্কুলটি পূর্ব্বে ডেভিড হেয়ারের পরিচালনাধীন ছিল, দরিদ্র ছাত্রেরা এখানে বিনা বেতনে অধ্যয়ন করতে পেত। পরে এখানেও বেতন লওয়া আরম্ভ হয়। তবে অন্যান্য স্কুলের অপেক্ষা এখানে বেতন কিছু কম ছিল। সোণামণিকেও পুত্রের পড়াশুনার জন্য অধিককাল আর বেগ পেতে হয়নি। গুরুদাস সব পরীক্ষাতেই প্রথম হতেন এবং যে-সব বৃত্তি ও পুরস্কার পেতেন তাতেই তাঁর পড়ার ব্যয় একরকম নির্ব্বাহ হয়ে যেত।

গোড়াতেই বলেছি, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন আদর্শ মানুষ। শৈশবে মাতার আশ্রয়ে সদ্‌বৃত্তিগুলি স্ফূরণ হতে পেরেছিল। সোণামণি পুত্রের কোন আব্‌দার বা অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতেন না। এ সম্বন্ধে নানা গল্প আছে। একবার গুরুদাস আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে আম খাওয়ার আব্‌দার করেন। পরেও পুত্র এইরূপ আব্‌দার করবে আর তিনি তখন তা পূরণ করতে পারবেন না, এজন্য ঘরে আম থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁকে দেন নি। অতিরিক্ত আব্‌দার দিলে লোভ বেড়ে যায়। মাতার শিক্ষাগুণে তাঁর লোভ-শূন্যতাও পুত্রের মধ্যে এইরূপে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। পরজীবনে পুত্রকে বহুস্থানে

নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে হত, কিন্তু তিনি কোথাও অন্নগ্রহণ করতেন না। পরীক্ষায় অন্য ছেলেকে হারিয়ে প্রথম হতে হবে এ ধারণা নিয়ে পড়া সোণামণি আদৌ পছন্দ করতেন না, কেননা এতে লোভেরই বৃদ্ধি হয় !

গুরুদাস প্রথম জীবনে কর্ম্ম উপলক্ষে বহরমপুরে যান। সেখানে ওকালতী ব্যবসায়ে তাঁর খুব পসার হয়। সোণামণি দেবীও পুত্রের সঙ্গে সেখানে গেলেন। কিন্তু বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র যাওয়া সোণামণির পছন্দসই ছিল না। বহরমপুরে পুত্রের অত পসার প্রতিপত্তি ; কিন্তু সোণামণির লোভ-শূন্যতারই জয় হ'ল। অত পসার ছেড়ে গুরুদাস কলিকাতায় ফিরে এসে হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করলেন। কিন্তু ভাগ্যদেবী গুরুদাসের অনুবর্ত্তিনী। হাইকোর্টেও তাঁর প্রচুর আয় হতে লাগল। তিনি ক্রমে হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন। সোণামণি পুত্রের উন্নতিতে অপরিসীম আনন্দ অনুভব করলেন বটে, কিন্তু যখন প্রস্তাব এল, চৌরঙ্গীতে বাসা করতে হবে তখন তিনি তাতে ঘোর আপত্তি জানালেন ; নিজের গৃহ তুচ্ছ হলেও পরের প্রাসাদের চেয়ে যে সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। গুরুদাস-জননীর এই ছিল শিক্ষা। তিনি স্বমতেই দৃঢ় রইলেন। তাঁর ইচ্ছায়ই এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হ'ল।

'আপনি আচরি ধর্ম্ম পরেরে শেখায়'—এই মহাবাণী সোণামণির জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল। কথা, কার্য্য, ব্যবহার—সকলের মধ্যেই সোণামণির ঐকান্তিকতা লক্ষিত হ'ত। মনে, কথায় ও কাজে তিনি এক ছিলেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হত। নিজের বলে তিনি কিছুই রাখতেন না, সব দিয়েই ছিল তাঁর শান্তি। সোণামণি শেষ বয়সে পৌত্রের নিকট গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করতেন। পৌত্র ঠাকুরমাকে বলেছিলেন যে, তিনিই তো জীবন্ত গীতা! সোণামণির জীবন ও কার্য্যকলাপ কৈশোর নাতির মনে ঐরূপ ধারণারই সৃষ্টি করেছিল।

সোণামণি আদর্শ জননী। তিনি নিজ মনোমত করে পুত্রকে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি কিন্তু কখনও ছেলেকে প্রহার করার পক্ষপাতী ছিলেন না। অন্যকেও এরূপ করতে দেখ্‌লে তিনি তাতে আপত্তি জানাতেন। তিনি বল্‌তেন,

"ছেলে মারে, কাপড় ছেঁড়ে,
নিজের ক্ষতি নিজে করে।"

সোণামণি পঁচাত্তর বছর বয়সে ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁর গুণপনা ও চরিত্র মাধুর্য্যের কথা সর্ব্বত্র

ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি ধর্ম্মপরায়ণা আচারনিষ্ঠা মহিলা ছিলেন। হিন্দুর আচার-ব্যবহারে তাঁর অটল বিশ্বাস ছিল। কিন্তু যাঁরা প্রচলিত হিন্দু রীতি-নীতির বিরোধী, তাঁরাও তাঁকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। সোণামণি দেবী সকলেরই বরণীয়।

জাতির স্মরণীয়

তোমাদের পূর্ব্বে একবার বলেছি, বড় মানুষদের পিতামাতার খোঁজ আমরা বড় একটা রাখি না। আগেকার দিনেও একথা যেমন সত্য ছিল, আজকের দিনেও একথা তেমনি সত্য। তথাপি তাঁদের সম্বন্ধে যা কিছু ছিটেফোঁটা জানা যায় তার মধ্যেই তাঁদের বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়ে থাকে। আমি এখানে পর পর এরূপ কয়েকজনের কথাই বল্‌ব।

প্রেসিডেণ্ট মাসারিকের কথা তোমরা অনেকেই হয়ত শোননি। তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী পুরুষ। তাঁর পাণ্ডিত্য ও রাজনীতিজ্ঞান ছিল অসাধারণ। তাঁরই চেষ্টা-যত্নে চেক জাতি সঙ্ঘবদ্ধ হয় এবং গত মহাযুদ্ধের পরে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন জাতিতে পরিণত হয়। প্রধানতঃ তাদেরই নিয়ে মধ্য-ইউরোপে যে চেকোশ্লোভাকিয়া রাষ্ট্র গঠিত হয় মাসারিক ছিলেন তার প্রথম প্রেসিডেণ্ট

বা সভাপতি। বর্ত্তমান মহাসমরের পূর্ব্বেই হিটলারের চক্রান্তে ইউরোপের মানচিত্র হতে এ রাজ্যটি বিলুপ্ত হয়েছিল। চেক জাতি এখন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হলেও মাসারিকের শিক্ষা তারা ভোলেনি। সুযোগ পেলেই যে তারা আবার মাথা নাড়া দিয়ে উঠ্‌বে তার লক্ষণ এখনই দেখা যাচ্ছে।

প্রেসিডেণ্ট মাসারিককে তাঁর মা কেমন করে মানুষ করেছিলেন সে কাহিনী বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। মাসারিকের মা ছিলেন অতি দরিদ্রের কন্যা। প্রথম জীবনে ভিয়েনায় কোন বড়লোকের বাড়ীতে ঝির কাজ করতেন। এই কাজ করার সময় তিনি যে শিক্ষা পেয়েছিলেন তারই ফল বর্ত্তেছিল সম্পূর্ণরূপে পুত্র মাসারিকে! বড়লোকের বাড়ী; তাঁরা শিক্ষায় খুবই অগ্রসর। লেখাপড়া শিখে তাঁদের মধ্যে কেউ বড় লেখক হয়েছেন, অধ্যাপক হয়েছেন, কেউ বা রাজদরবারে উজীর ওমরাহ হয়েছেন। তিনি বুঝলেন এসকলের মূলে রয়েছে জ্ঞানার্জ্জন। তিনি যদি কোনদিন ছেলের মা হন তা হলে না খেয়েও ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবেন।

মাসারিকের মার বিবাহ হয় অষ্ট্রিয়া-সম্রাটের একজন কোচোয়ানের সঙ্গে। কোচোয়ান ভিয়েনায় থাক্‌তেন না।

দূর দূর অঞ্চলে যেখানে যেখানে রাজপ্রাসাদ ছিল সেখানে সেখানে তাঁকে যেতে হত। মাসারিক যখন জন্মালেন তখন তাঁর পিতামাতা বাস করতেন ভিয়েনা থেকে দূরে একটি গ্রামে। এখানে সম্রাটের প্রাসাদ ছিল। তিনি নিরালায় বসবাসের জন্য ও শিকারের উদ্দেশে এখানে মাঝে মাঝে এসে থাক্‌তেন। ঐ সময়ও তিনি এখানে এসেছিলেন। পুত্রের মুখ দেখে মা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। ভিয়েনায় থেকে তিনি মনে মনে যে সঙ্কল্প করেছিলেন তা একদিন কাজে দেখবার সুযোগ ঘটল।

কিন্তু সম্রাটের চাকর-সন্তানদের যে লেখাপড়া শিখতে নেই! কোচোয়ানের ছেলে কোচোয়ানি করবে, তার আবার লেখাপড়া শেখা কিসের জন্য? মাসারিকের যতই বয়স বড় হতে লাগল, মার ততই ভাবনা বাড়্‌ল কি ক'রে এই বাধা অতিক্রম করা যাবে। তিনি শেষে একদিন সাহসে ভর করে সম্রাটের কাছে দরখাস্ত করলেন, যেন দয়া করে তাঁর ছেলেকে লেখাপড়া শেখ্‌বার অনুমতি দেওয়া হয়। একজন রমণীর নিকট থেকে এই করুণ আবেদন পেয়ে সম্রাটের খুব দয়া হ'ল। চাকর-বাকরদের লেখাপড়া শেখার যদিও তিনি পক্ষপাতী নন তথাপি

আবেদন তিনি অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। তিনি এ স্ত্রীলোকটির আবেদন মঞ্জুর করলেন। মাসারিকের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ এইরূপে মার ঐকান্তিক চেষ্টায় উন্মুক্ত হয়ে গেল।

মা মাসারিককে অতি কষ্টে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। মাসারিক মার কথা কখনও ভুলতে পারেন নি। তিনি বলেছেন, "আমার সব রকম উন্নতির জন্যই আমি আমার পুণ্যবতী মায়ের যত্ন, ত্যাগ, প্রেম ও নিপুণ শিক্ষার কাছে ঋণী।"

* * *

কামাল পাশার নাম তোমরা কে না শুনেছ? মাত্র চার পাঁচ বছর পূর্ব্বে তিনি মারা গিয়েছেন। শেষ বয়সে তিনি নাম নিয়েছিলেন 'আতাতুর্ক' বা তুর্কী জাতির জনক। যিনি একটা জাতির জনক তাঁর মা না জানি কত শক্তিমতী ছিলেন।

কামালের অতি অল্প বয়সেই তাঁর পিতা আলি রোজা মারা যান। কামালেরা ছিলেন দুই ভাই। মা জুবিদা

কচি ছেলে ছুটিকে নিয়ে ভাইয়ের বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। ভায়ের চাষবাসের কাজ একাজে তাঁকে সাধ্যমত সাহায্য করতে হবে এ তো জানা কথা। ছোট ছেলে কামালকে বসে থাক্‌তে হত বাগানে ফল-মূল-লোভী পাখীদের তাড়া করবার জন্য।

এভাবে কয়েক বছর চলে। মা জুবিদা কিন্তু এতে মনে শান্তি পেলেন না। ছুটো অন্নের জন্য ছেলের ভবিষ্যৎ মাটি হতে চলেছে। তিনি ভাবলেন ভায়ের বাড়ী না ছাড়তে পারলে ছেলের লেখাপড়া মোটেই হবে না। কিন্তু সন্তানকে কোল ছাড়া করা মায়েদের পক্ষে বড়ই কঠিন কাজ। তুর্কী মায়েদের পক্ষে ত একেবারে অসম্ভব একথা লোকে বল্‌ত। কিন্তু জুবিদা সাধারণ হ'তে কতকটা স্বতন্ত্র ধরণের রমণী ছিলেন। পুত্রকে তাঁর মাসার বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন বিদ্যার্জ্জনের জন্য। পুত্রকে কোল ছাড়া করায় জুবিদা মনে কষ্ট পেলেন, কিন্তু কর্ত্তব্য-বুদ্ধির কাছে এ কষ্ট কিছুই নয়।

জুবিদা কামালের তীক্ষ্ণ প্রতিভার আভাস পেয়েছিলেন। বুদ্ধিমতী নারী তা পাবেনই বা না কেন? জুবিদার ইচ্ছা ছিল পুত্র মুসলমান শাস্ত্র পাঠ করে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হবেন। কিন্তু বিধাতার বিধান ছিল

অন্যরূপ। সামান্য শিক্ষা লাভ করেই যুদ্ধবিদ্যা শেখার দিকে কামালের ঝোঁক গেল। কামাল মাকে একথা বল্‌তে পারেন নি, কারণ তাঁর ভয় ছিল যে, মা জান্‌লে হয়ত তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। মা যদি একবার নিষেধ করেন তা হলে তাঁর যুদ্ধবিদ্যা আর শেখাই হবে না। কামাল জুনিয়র মিলিটারি কলেজে ভর্ত্তি হলেন।

জুবিদা কিন্তু একথা শুনে কামালকে কোনরূপ নিন্দামন্দ করেন নি। কারণ তিনি বুঝেছিলেন তাঁর ছেলের যদি সত্যই প্রতিভা থাকে তা' হলে তা যে-কোন ক্ষেত্রেই হোক প্রকাশ হয়ে পড়বে। জুবিদার নিকট সমগ্র তুর্কী জাতি আজ কৃতজ্ঞ। তাঁর ঐকান্তিক যত্নে কামালের প্রতিভা স্ফূরণের সুযোগ ঘটেছিল। জুবিদা আজ সকলের স্মরণীয়।

* * *

বর্ত্তমান মহাসমরে মুসোলিনিকে হিটলারের দোসর বলেই আমরা জানি। তিনি ছিলেন ইটালীর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। সম্প্রতি তাঁর পতন হয়েছে। ইটালীর নূতন

চিয়াং কাই-শেক ও তাঁর মাতা ৮৭ পৃষ্ঠা

শাসকবর্গ তাঁকে বন্দী করে রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁকে এরূপভাবে আর বেশীদিন আটক থাকতে হয় নি। হিটলার সম্প্রতি কৌশল করে, প্যারাসুট বাহিনীর সাহায্যে তাঁকে একরকম ছিনিয়েই নিয়ে এসেছেন। বর্ত্তমানে মুসোলিনী রয়েছেন জার্ম্মানীতে, সেখান থেকে তিনি ঘোষণা করেছেন যে, তিনি পূর্ব্বের ন্যায় এখনও ফাসিষ্ট ইটালীর কর্ত্তা। যাহোক, মুসোলিনী জীবনে যতটুকু সাফল্য লাভ করেছেন তাও তাঁর মাতার শিক্ষা গুণে। আত্মচরিতে মুসোলিনি লিখেছেন,

"আমার সব চেয়ে বেশী টান ছিল মায়ের উপর। তিনি যত শান্ত, তত কোমল, অথচ তত তেজস্বী ছিলেন। তাঁর নাম রোজা। মা আমাদের যে শুধু লালন পালন করতেন তা নয় তিনি পাঠশালায় শিক্ষয়িত্রীর কাজও করতেন। আমি সেই অপরিণত বয়সে বিস্মিত হতাম, তাঁর ধীর স্থির হয়ে অত নিপুণ ভাবে কাজ করার ক্ষমতা দেখে। আমার কেবলই ভয় হত, আমার কাজে মা হয়ত আমার প্রতি অপ্রসন্ন হবেন। শৈশবের নানারকম দুষ্টুমি মার কাছ থেকে লুকোবার জন্য আমি আমার ঠাকুরমা, এমন কি পাড়াপড়শিদেরও আশ্রয় নিতাম। আমার আতঙ্ক কিসে তা তাঁরা বুঝতেন।

আমার আতঙ্ক হত—মা এসব জানতে পারলে কতই না মনঃকষ্ট পাবেন।”

কামালের মা জুবিদার ন্যায় বোজাও পুত্রের প্রতিভার আভাস পেয়েছিলেন। তোমরা হয়ত জিজ্ঞাসা করবে কি করে এঁরা এরূপ আভাস পান? এব হয়ত ব্যাখা করা যায় না। তবে প্রিয়জনের কথা, তার উন্নতি অবনতির কথা মনে জাগা স্বাভাবিক। মুসোলিনি লিখেছেন, মার মুখে তিনি নিজের সম্বন্ধে একটি কথা বহুবার শুনেছেন, সে ভবিষ্যতে বড় রকমেব একটা কিছু হবে। তিনি আরও বলেন, তাঁর মা তাঁর সম্বন্ধে উচ্চ আশা পোষণ করতেন বলেই তিনি অত বেশী কষ্ট পেয়েছেন। কারণ উন্নতির যে প্রধান লক্ষণ, কোন কাজ ধীর স্থির হয়ে করা আর তাতে লেগে থাকা—রোজা বেঁচে থাকতে মুসোলিনি-দ্বারা কখনও তার ব্যত্যয় হয় নি। কৈশোরে ও যৌবনে মুসোলিনি ভবঘুরের মত এখানে সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তবে তিনি তাঁর বইয়ে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, মার শিক্ষাগুণেই তিনি জীবনে যা কিছু কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন।

"একটু আগেই বলেছি, হিটলারের দোসর হলেন মুসোলিনি। হিটলারের প্রতাপে আজ মেদিনী কম্পিত। বর্ত্তমান মহাসমর চার বছর পূর্ণ হয়ে সবে পাঁচ বছরে পড়ল। এই ক' বছরে পৃথিবীর এমন কোন অঞ্চল নেই যেখানে তাঁর প্রতাপ কিছু-না-কিছু অনুভূত হয়েছে। যুদ্ধ বাধবার পূর্ব্বেই তাঁকে বিংশ শতাব্দীর নেপোলিয়ন বলে অনেকে আখ্যা দিয়েছিলেন।

এহেন হিটলারের পিতামাতার তাঁব নিজের শৈশব শিক্ষার কথা শুনতে তোমাদের নিশ্চয়ই আগ্রহ হবে। হিটলারের পিতামাতা অতি সাধাবণ মানুষ ছিলেন। তাঁর শৈশব শিক্ষা থেকে কেউ কল্পনাও কবতে পারে নি যে, তিনি পরে এমন শক্তিমান্ পুরুষ হবেন। সাধারণ মানুষদের কথা পুস্তকাদিতে খুব কমই লেখা হয়ে থাকে। কাজেই হিটলারের পিতামাতার কথাও বেশী কিছু জানা আমাদের পক্ষে কঠিন। তবে হিটলার আত্মজীবনীতে তাঁদের কথা কিছু কিছু লিখে রেখেছেন। এরই উপর নির্ভর করে আমি তোমাদের কিছু বল্‌ব।

হিটলার তাঁর পিতার তৃতীয় পক্ষের সন্তান। তের বছর পূর্ণ হবার পূর্ব্বেই তাঁর পিতামাতা উভয়েরই মৃত্যু হয়। পিতা ছিলেন দরিদ্র কৃষকের ছেলে। কৃষিকর্ম্মে

পরিবারের দারিদ্র ঘুচল না। তাই তিনি তের বছর বয়সে বাড়ীর বা'র হলেন। তিনটি মাত্র ও-দেশী টাকা সম্বল করে তিনি ভিয়েনায় উপস্থিত হন। সেখানে তিনি মুচির কাজ শিখ্‌তে আরম্ভ করেন। তখন ইংরেজী ১৮৫০ সাল। সতর বছর বয়সে শিক্ষানবিশের কার্য্য শেষ হয়। কিন্তু এসময় দেশে ভীষণ মন্দা উপস্থিত হ'ল। কাজেই ও-কাজ থেকে কিছু উপার্জ্জন করার আশাও তাঁকে ছেড়ে দিতে হ'ল।

সে-যুগে যাঁরা রাজ-সরকারে কর্ম্ম করতেন সমাজে তাঁদের খুব মান মর্য্যাদা হ'ত। পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম শিখলেও হিটলারের পিতার মনে সরকারী চাক্‌রির প্রতি বরাবর একটা আন্তরিক আসক্তি ছিল। তিনি সরকারী কর্ম্ম খুঁজতে লাগলেন। অনেক চেষ্টার পর অবশেষে তেইশ বছর বয়সে তিনি সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত হলেন। হিটলার বলেন, তাঁর পিতাকে যৌবনে দারিদ্র্যের সঙ্গে এতই লড়াই করতে হয় যে, অল্প বয়সেই তিনি বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন।

সরকারী কর্ম্ম ব্যপদেশে তাঁকে অষ্ট্রিয়ার নানাস্থানে গমন করতে হ'ত। ব্রনো-অন-দি ইন শহরে তিনি কয়েক বছর কাটান। এইখানেই হিটলারের জন্ম হয়, তাঁর শৈশবও এইখানেই কাটে। এর পরে তিনি যান

পাস্সু নামক শহরে। এই রকম এ-শহর ও-শহর করে ছাপ্পান্ন বছর বয়সে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। হিটলার বলেন যে, পিতা এর পর লাম্বার্ক শহরের উপকণ্ঠে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করে দেন। এইরূপে তিনি পিতৃপুরুষের জীবিকাই পুনরায় গ্রহণ করলেন।

কৈশোরে ও যৌবনে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝে শেষ বয়সে পিতা কতকটা স্বাচ্ছন্দ জীবন যাপন করতে পেরেছিলেন। সরকারী চাক্‌রিই ছিল এর মূলে। পুত্রকেও তিনি শৈশব থেকে এর জন্য প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন। কাজেই সাধারণ লেখাপড়া শেখাবার জন্য তিনি তাঁকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দিলেন। নির্দ্দিষ্ট মান পর্য্যন্ত পাঠাভ্যাস করে হিটলারও সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত হবেন এবং উত্তরোত্তর পদোন্নতি লাভ করে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন ও সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন—পিতার ছিল এই আন্তরিক কামনা। কিন্তু আগেই বলেছি, অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ইহধাম ত্যাগ করলেন।

পিতা সরকারী কর্ম্মে দিনভর ব্যস্ত থাক্‌তেন, মাতা বাড়ীর সব দেখাশুনা করতেন এবং অতীব নিষ্ঠার সঙ্গে দৈনন্দিন কাজ করে যেতেন। পিতার মৃত্যুর পর সন্তান-পালনের ভার পড়ল সম্পূর্ণই মাতার উপর। পতিপরায়ণা

রমণী পতির ইচ্ছা যাতে পূর্ণ হয় তার জন্য পুত্রের শিক্ষার দিকে আরো বেশী করেই অবহিত হলেন। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর অল্প দিন পরেই হিটলার এক কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। চিকিৎসক পরামর্শ দিলেন—স্কুলে পড়ার যে পরিশ্রম তা তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। মা আর কি করেন, পুত্রকে স্কুল ছাড়িয়ে দিতে বাধ্য হলেন। তিনি তাঁকে কম-শ্রমসাধ্য চিত্রবিদ্যা শেখাবার জন্য একাডেমিতে ভর্ত্তি করে দিলেন। চিত্রবিদ্যা শিক্ষার প্রতি হিটলারের স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। তিনি মন দিয়ে চিত্রবিদ্যা শিখতে লাগলেন। এর পরবর্ত্তী ঘটনা হিটলার জীবনীতেই তোমরা পাবে।

হিটলার মাতার প্রতি খুবই ভক্তিমান্ ছিলেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "আমি বাবাকে সম্মান করতাম, কিন্তু ভালবাসতাম আমার মাকে।"

এখন, আমরা পশ্চিম থেকে পূর্ব্ব দিকে আসব। চিয়াং কাই-শেকের কথা তোমরা কে না শুনেছ? চীন

যে সাত আট বছর ধরে প্রবল-প্রতাপ জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে এখনও স্বাধীনতা বজায় রাখ্‌তে পেরেছে তা প্রধানতঃ এই চিয়াঙেরই কৃতিত্ব গুণে। তাঁর পিতৃপুরুষ ও শৈশব সম্বন্ধেও আমাদের কিছু জানা দরকার।

হিটলারের মত চিয়াং কাই-শেকও পিতার তৃতীয় পত্নীর সন্তান। চিয়াঙের যখন ন' বছর বয়স তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। চিয়াঙের লালনপালনের ভার স্বভাবতঃই তাঁর মায়ের উপর পড়ল। মা ছিলেন বড়ই দয়ালু; বিপন্ন ব্যক্তিদের, বিশেষতঃ বিধবা ও মাতৃহীন শিশুদের প্রতি তাঁর দয়ার অন্ত ছিল না। পতি বিয়োগের পরও নিজের সামান্য সঞ্চয় থেকে তিনি তাঁদের মুক্ত-হস্তে দান করতেন। স্কুল ও হাসপাতালেও তিনি দান করেছিলেন।

চিয়াং-জননী স্বধর্ম্মনিষ্ঠা মহিলা। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তথাগতের পূজার্চ্চনা তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত হয়েছিল। পুত্রের মধ্যেও শৈশব থেকেই তাঁর এই শিক্ষা অনুপ্রবিষ্ট করতে চেয়েছিলেন। তিনি পুত্রকে প্রায়ই বল্‌তেন, "আমি এই মাত্র চাই যে, তুমি তোমার দেশকে ভালবাস, তোমার পূর্ব্বপুরুষরা মানী লোক ছিলেন, তাঁদের সুনাম তুমি অক্ষুণ্ন রাখ।"

চিয়াঙের পিতৃ-পিতামহের চাষ-আবাদ ছিল। তাঁরা কৃষিকর্ম্ম করে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করেছিলেন, সমাজেও কতকটা প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন। নিষ্ঠুর মাঞ্চুরাজ ও তাঁর অত্যাচারী কর্ম্মচারীদের দৃষ্টি সেই সুদূর পল্লীর চিয়াং-পরিবারের উপরও পড়ে। অতিরিক্ত কর ও সেলামী দিয়ে চিয়াং-পরিবারের খুব সামান্যই অবশিষ্ট থাক্‌ত। চিয়াং-জননী তাই দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে সংসার চালাতেন। চিয়াং বলেছেন, "মা নিজ অধ্যবসায় বলে আসন্ন ধ্বংস হতে আমাদের বাঁচিয়েছিলেন।

চিয়াং বলেন, তাঁর প্রতি মাতার স্নেহ ছিল অগাধ; কিন্তু তাই বলে তিনি অন্যায়ের কখনও প্রশ্রয় দিতেন না। কোন কিছু অন্যায় করলে মা কঠোর ভাষায় ভৎ´সনা করতেন। চিয়াং সময় মত বাড়ী ফিরতে দেরী করলে কোথায় ছিলেন, কি করছিলেন এইরূপ কত কথাই না তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন। স্কুল হতে বাড়ী ফিরলে দিনের পড়া সম্বন্ধেও তিনি প্রশ্ন করতেন। শৈশবেই তিনি পুত্রকে স্বহস্তে কাজ করতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। চিয়াঙের কথায়ই বলি,—"আমি যখন ছোট ছিলাম আমার জননী আমাকে দিয়ে ঘর ঝাঁট দেওয়া, মেঝে পরিষ্কার করা, ভাত ও অন্য তরিতরকারী রান্না করা, বাসন মাজা

প্রভৃতি কাজ করাতেন। ভাতের ফেন গাল্‌তে গিয়ে অসাবধানতা বশতঃ যদি কয়েকটি ভাত মাটিতে পড়ে যেত অথবা কাপড় পরায় যদি কোনরূপ ত্রুটি দেখা যেত তা হলে মা আমায় ভীষণ তিরস্কার করতেন।"

নিজের নিকটে রেখে গ্রামের স্কুলে যতটা শিক্ষা দেওয়া সম্ভব মাতা পুত্রকে ততটা শিক্ষা দিলেন। বিদেশে গিয়ে চিয়াঙের যুদ্ধ বিদ্যা শিখবার কথা হ'ল। চিয়াং বলেছেন, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের এতে ঘোর আপত্তি ছিল, কিন্তু তাঁর মা কোনই আপত্তি করেন নি ! পরন্তু তিনি অর্থাদি দিয়ে পুত্রকে বরাবর সাহায্যই করেছেন। যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা শেষ করে চিয়াং দেশে ফিরে এলেন ও বিপ্লবী দলে যোগ দিলেন। এ সময়কার কথা প্রসঙ্গে চিয়াং বলেছেন, "আমি যখন বিপ্লবীদলে ভিড়লাম ও জাতির জন্য জীবন উৎসর্গ করার সঙ্কল্প করলাম তখন অন্য সকলে আমাকে চিঠিপত্র লেখাও বন্ধ করে দিয়েছিল ; তখন মার আশীর্ব্বাদই আমার একমাত্র সম্বল হয়েছিল এবং তিনি যতখানি সম্ভব আমাকে সাহায্যও করেছিলেন।

চীনে যখন রিপাব্‌লিক প্রতিষ্ঠিত হয় তখন চিয়াঙের বয়স পঁচিশ বৎসর। তিনি এতদিন গৃহ-সংস্কারে মন দিতে পারেন নি। এর পর কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে এই দিকে মন

দিলেন। মাকে খুশী করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু অল্প দিন পরেই দেখা গেল, চীনে রিপাব্লিক প্রতিষ্ঠিত হলেও শান্তি স্থাপিত হয় নি। চীনে অন্তর্দ্বন্দ্ব পুনরায় সুরু হলে আবার মা আমার সহায় হলেন। চিয়াং-জননী বরাবর গৃহ আগ্লে ছিলেন। তিনি পুত্রকে বলতেন, "তোমার পিতার মৃত্যুর পর আমি খুবই কষ্টে পড়লাম। তখন সময় সময় এত অসহ্য বোধ হত যে, আমি ভেবেই উঠতে পারতাম না কি করে সংসার চালাব। আমার কিন্তু বরাবর এই বিশ্বাস ছিল যে, তোমার ন্যায় পিতৃহীন শিশুর যথোপযুক্ত শিক্ষাদানই পরিবারের ভাবী উন্নতির একমাত্র উপায়।"

বিপ্লবের মধ্যে যখন নৈরাশ্য দেখা দিত তখনও মাতার উপদেশ চিয়াংকে উজ্জীবিত করত। মাতা তাঁকে এই উপদেশ দিতেন, "যেরূপ নিষ্ঠার সঙ্গে আমরা পরিবারকে সেবা ও রক্ষা করি সেইরূপ নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের জাতিকেও সেবা ও রক্ষা করা কর্ত্তব্য। এই আদর্শে কাজ করলে দেশ থেকে অত্যাচার অনাচার অবিচার কোথায় পালিয়ে যাবে।" তিনি চিয়াঙের মনে এই ধারণা দৃঢ়মূল করিয়ে দিয়েছিলেন যে, মার প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে যথোচিত কর্ত্তব্য করে গেলেই সবটা করা হয় না, জাতির

প্রতি কর্তব্যও এর অঙ্গীভূত। মাতার শিক্ষাই আজ পুত্রের জীবনে প্রধান অবলম্বন।

চিয়াং যে ভবিষ্যৎজীবনে এতটা নিয়মতন্ত্রী হয়েছেন এর মূলেও রয়েছে তাঁর মার শিক্ষা। চিয়াং বলেছেন, "আমি যা কিছু কাজ করেছি তার সার্থকতা সম্বন্ধে মা নিঃসন্দেহ ছিলেন। আমার সাফল্যের জন্য তিনি আমাকে সর্ব্ব প্রকারে সাহায্য করতেন—কখনও কায়িকভাবে, কখনও বা তথাগতের নিকট প্রার্থনা করে। শৈশবে মা আমায় খুবই ভালবাসতেন। অন্য দশজনের ভালবাসার চেয়ে এ ভালবাসা কতকটা স্বতন্ত্র ছিল। তিনি ছিলেন একজন কঠোর নিয়মতন্ত্রী—নিয়ম পালনে কোন ব্যত্যয় তিনি সহ্য করতেন না।"

১৯২১ সালের ৪ঠা জুন এই বীর নারী দেহত্যাগ করেন।

* * *

আর একজনের পিতামাতার কথা তোমাদের কিছু বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করব। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী জগতে একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে পূজিত। মহাত্মা গান্ধী

নামে তাঁকে আজ বালক বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ সকলেই চেনে। তিনি অহিংসা দ্বারা হিংসার জয়ে বিশ্বাসী, আর এই বিশ্বাস নিয়েই প্রায় পঞ্চাশ বছর যাবৎ স্বদেশবাসীর সেবা করে এসেছেন। তাঁরই শিক্ষার প্রভাবে কোটি কোটি নরনারী মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

মহাত্মা গান্ধী জাতিতে বণিক বা বেণে, গান্ধী পদবীতেই তা প্রকট। কিন্তু তাঁর পিতামহ থেকে বংশের কেউই আর বণিক্‌-বৃত্তি করেন নি। পিতামহ উত্তমচাঁদ গান্ধী প্রথমে পোরবন্দর, এবং পরে জুনাগড় রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। জুনাগড়ের দেওয়ান নিযুক্ত হয়ে তিনি দরবারে উপস্থিত হলেন এবং নবাবকে বাঁ হাতে সেলাম করলেন! এ দেখে সকলে তো অবাক্। অবিলম্বে কৈফিয়ৎ তলব হ'ল। উত্তমচাঁদ নবাবকে বললেন, "আমার ডান হাত আমি পোরবন্দরকে দিয়েছি, তাই বাঁ হাতে এখন সেলাম করি; আপনাকে অপমান করার জন্য এরকম করিনি।"

উত্তমচাঁদের পুত্র করমচাঁদ ছিলেন রাজকোটের দেওয়ান। তিনি লেখাপড়া খুব কমই জান্‌তেন, কিন্তু তাঁর বৈষয়িক বুদ্ধি ছিল অসাধারণ, আর এই বুদ্ধিবলেই

তিনি সুকৌশলে দেওয়ানের কাজ করে গেছেন। তিনি খুব তেজী লোক ছিলেন। করদ রাজ্যে ইংরেজ-প্রতিনিধির প্রতাপ খুব বেশী। এখানকার প্রতিনিধির একজন বিশিষ্ট ইংরেজ কর্ম্মচারী এক সময় কোন অন্যায় কাজ করলে করমচাঁদ তাঁকে খুব ধম্‌কে দেন। কিন্তু এর ফল হ'ল গুরুতর। ইংরেজ প্রতিনিধি নিজের কর্ম্মচারীর পক্ষ নিয়ে দেওয়ানের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করলেন। কিন্তু করমচাঁদ বেঁকে বস্‌লেন ; অন্যায়ের প্রতিবাদ তিনি করেছেন, এজন্য তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে ?—তা কখনই হতে পারে না। তাঁর এই জবাবে ঐ প্রতিনিধি একটা মাঝামাঝি রফা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এইরূপ পিতার পুত্র আমাদের এই গান্ধীজী।

পিতার ন্যায় গান্ধীজীর মাতা পুত্তলীবাঈও ছিলেন খুবই বুদ্ধিমতী ও কর্ত্তব্যপরায়ণা। কিন্তু এ সকলের উপরেও তিনি ছিলেন ধর্ম্মশীলা নারী। পূজার্চ্চনা ও ব্রতাদি পালনে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহের কথা গান্ধীজী আত্মচরিতে লিখে গেছেন। তিনি মাসের মধ্যে বহুদিন একাহারী থাক্‌তেন। উপবাসেও তিনি ছিলেন সুপটু। দেবতার কাজে দৈহিক কষ্ট—সে তো সকলের চেয়ে বরণীয়। এই ছিল তাঁর মন্ত্র। মহাত্মা গান্ধীর মধ্যেও মাতার ধর্ম্মনিষ্ঠা

পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। উপবাস দ্বারা আত্মশোধন—এ শিক্ষা তিনি মাতার নিকটই পেয়েছেন। তাঁর জীবনে বহু বার তিনি এই শিক্ষা প্রয়োগ করেছেন।

মহাত্মা গান্ধী লিখেছেন, কৈশোরে সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে প্রলোভনে পড়ে তিনি কখনও কখনও কুখাদ্য গ্রহণ করেছেন, এবং এরূপ কোন কোন কাজ করেছেন যাতে কিছু কিছু ঋণও হয়েছে। কিন্তু তাঁর পিতা এমন রাশভারী অথচ অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন যে তাঁর নিকট থেকে তিনি কোন কিছুই গোপন করতে পারতেন না। গোপন করার চেষ্টা করলে মন যেন অস্থির হয়ে উঠত। পিতার শিক্ষা গুণেই তিনি আজ সমস্ত প্রলোভনের উপরে উঠতে পেরেছেন। পিতা বেশীদিন জীবিত ছিলেন না; গান্ধীজীর ষোল বছর বয়সের সময় তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

পিতার মৃত্যুর পর মাতাই হলেন পরিবারের কর্ত্রী। আঠার বছর বয়সে মহাত্মা গান্ধী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। তখন তাঁর ইচ্ছা হ'ল বিলাতে গিয়ে ব্যারিষ্টারী পড়বেন। কিন্তু মাতার অনুমতি ভিন্ন তো এ হবার জো নেই; তাঁর অনুমতি যে সকলের আগে প্রয়োজন। তিনি একদিন মাকে তাঁর মনের কথা

বল্‌লেন। পুত্তলীবাঈ বুদ্ধিমতী মহিলা, তিনি পুত্রের মনোবাঞ্ছা পূরণে বাধা দিলেন না। তবে গুজরাটেও তখন খুব ইংরেজীয়ানার ধুম পড়ে গেছে জান্‌তেন। ইংরেজীয়ানায় প্রমত্ত না হয়ে পুত্র যাতে স্বধর্ম্মে আস্থাবান্ থাকে এজন্য তাঁকে দিয়ে তিনি তিনটি প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন—"বিলাতে গিয়ে তিনি মদ্য, মাংস ও নারী এই তিনটী স্পর্শ করবেন না।" গান্ধীজী বলেছেন, এই প্রতিজ্ঞা বিলাত-প্রবাসকালে তাঁকে বহু প্রলোভনের হাত থেকে মুক্ত করেছিল। পিতামাতার দূরদৃষ্টিপূর্ণ লালন ও শিক্ষার গুণেই গান্ধীজী আজ জগৎপূজ্য। তাঁরা তাই শুধু ভারতবাসীর নয়, বিশ্ববাসীরও স্মরণীয়।

—শেষ—

পরিশিষ্ট

এই পুস্তক রচনায় নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি থেকে সাহায্য পেয়েছি। ছাত্র-ছাত্রীরা এসব বই পড়লে অনেক নূতন কথা জান্‌তে পারবে।

Shivaji and His Times.

By Jadunath Sarkar. Third Edition. 1929.

The Life of Benjamin Franklin

Written by Himself. Vol. I. 1879.

The Mothers of Great Men.

By Mrs. Ellis. New Edition. 1860.

বিদ্যাসাগর—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ। ১৩১৬

বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী, সাহিত্যভাগ·

—রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস। ১৩৪৪

Reminiscenes, Speeches and Writing of

Sir Gooroodas Banerjee. 1927.

Auto-Biography of Benito Mussolini. 1928.

Mein Kampf. By Adlof Hitler. Unexpurgated.

Chiang Kai-Shek.

By Hollington K. Tong. Vols. I & II. 1937.

The Story of My Experiments with Truth.

By M. K. Gandhi. Vol. I. 1927.